KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLG	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78×24.13 c.m.
Vol. & Number : ২১/- ২১/- ২১/- ২১/- ২১/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ ॥ June 1973 আষাঢ় ১৩৮০ ॥ July 1973 ভাদ্র ১৩৮০ ॥ Sep 1973 কার্তিক ১৩৮০ ॥ Nov 1973 অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ॥ Dec 1973
	Condition : Brittle Good
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

CD. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

"আমি যদি

রেলের অধিকর্তা

হ'তাম.....

রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম—জনসাধারণকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে যাত্রীরা টিকিট না কিনলে ট্রেণ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হ'বে এবং তাঁরা নিজের থেকে পাওনা ভাড়া দিলে আবার ট্রেণ চলাচল সুরু করা হ'বে।"

—মহাত্মা গান্ধী

পূর্ব রেলওয়ে

একবিংশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

লোকায়ত শিল্পকলা : ছো-নাচের মুখোশ ॥ শিবেন্দু মান্না ৩৬৫

শতবর্ষ পূর্বে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা ও অভিনীত নাটক ॥ মঞ্জু ঘোষ ৩৭২

কবিতীর্থ বর্ধমান ॥ শৈলেনকুমার দত্ত ৩৮৪

অসমীয়া সাহিত্যের স্রষ্টা শঙ্করদেব ॥ পরমেশ রায় ৩৮৮

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : রুচি বিকার—পূজায় ॥ রবি মিত্র ৩৯২

আলোচনা : বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩৯৪
আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো গ্রোটিয়াস ॥ সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ৩৯৭

সমালোচনা : লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ॥ অরবিন্দ ভট্টাচার্য ৪০২

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

We help our workers to help themselves.

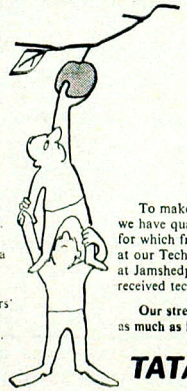

We think our workers are entitled to more than a fair deal. So, in addition to job security, they enjoy many other benefits, a number of welfare amenities.

But this is not all.

We also recognise the workers' need for self-development by offering higher job opportunities.

To make promotions impartial, we have qualifying trade tests, for which free training is offered at our Technical Institute at Jamshedpur. Here, 10,000 have received technical training so far.

Our strength is in our people as much as in our steel.

TATA STEEL

TN 2013A

অগ্রহায়ণ
তেরশ' আশী

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

লোকায়ত শিল্পকলা ঃ ছো-নাচের মুখোশ

শিবেন্দু মান্না

মধ্যযুগে—উর্দ্ধপক্ষে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বলা চলে, গ্রাম বাংলার শিল্প সংস্কৃতিই ছিল বাংলার কেন্দ্রমণি। কিন্তু এদেশে ইংরেজ আগমন, অক্ষম মেরুদণ্ডহীন শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাতের পর থেকেই গ্রাম বাংলার জনপদ বিশেষতঃ সাহিত্য সংস্কৃতি, গ্রামীণ শিল্পকলার ওপর 'শহুরে কালচার' যে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল তাতে আর কখনও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি। 'সারা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে পুরাণো ভূস্বামীদের অবস্থার অবনতি ঘটছিল ক্রমাগত, তাদের জমিদারী হ্রাস পাচ্ছিল দ্রুত, প্রাচীন রাজবংশগুলি অর্থ দৈন্য বশত নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল একে একে। মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল, সেই ভার গিয়ে পড়েছিল নতুন একদল ইজারাদারের হাতে।···কালক্রমে পুরাণো জমিদারদের স্থানচ্যুত করে সামাজিক প্রাধান্যও পেয়ে উঠলো রাজস্ব আদায়কারীর এই জমিদারেরা। বলা যায় মুর্শিদকুলির সময় থেকে কর্ণোয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল পর্যন্ত সমানে চলেছিল এই স্থান বদলের সমাজ বদলের পালা।' ১৭৭৪ সালে কলকাতা শহর মর্যাদা পেল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীরূপে, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে 'কলকাতা' সেই যে দেদীপ্যমান হতে শুরু করল, আজ বিংশ শতকের সত্তর দশকে এসেও তার সর্বগ্রাসীতার হাত থেকে গ্রাম বাংলার জনপদ ও সংস্কৃতি আপনাকে রক্ষা করতে পারে নি। অথচ মধ্যযুগেও রাজনীতি ছিল, রাজদরবার ছিল, রাজ্যের ভাঙাগড়া ছিল, ছিল শিল্পীর স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রাজদরবারের আনুকূল্য কিন্তু কখনো তা আগ্রাসী রূপ ধারণ করে নি। মধ্যযুগে রাজদরবারের আনুকূল্য ব্যতীত গ্রামবাংলার শিল্প ও শিল্পীর বেঁচে থাকার উপকরণ যে পরিমাণে সুলভ ছিল আজ সেই পরিমাণেই তা অলভ্য হয়ে উঠেছে। ফলে গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির গোত্রান্তর ঘটে

যাচ্ছে। লোকায়ত গ্রামীণ শিল্পের এক একটি ক্ষীণ অথচ উজ্জ্বল ধারা কলকাতার প্রভাব মুক্ত দূর দূরান্তের গ্রামে কোথাও কোথাও এখনও জীবিত। এই জীবিত এবং উল্লেখযোগ্য শিল্পধারার অন্যতম হোল ছো-নাচের মুখোশ। পশ্চিমবঙ্গে ছো-নাচ এবং ছো-নাচের মুখোশ তৈরীর কেন্দ্র হোল : পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার চড়িদা বা চোড়ডা গ্রাম [জে. এল. নং. ৮৯] এবং ঝাড়গ্রাম থানার ডোমরদি গ্রাম [জে. এল. নং ৩৬৯]। অবশ্য ডোমরদি গ্রামে খুব সীমিত সংখ্যক শিল্পী [যাদের সংখ্যা ১৫ জনের মধ্যেই সীমিত] কাজ করে থাকে এবং ডোমরদি গ্রামের শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্ভব চড়িদার শিল্পীগোষ্ঠী থেকেই—ফলে খ্যাতির সিংহভাগ শেষোক্ত দলেরই প্রাপ্য হয়ে গেছে। চড়িদাতে উন্নত মানের ছো-মুখোশ শিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ ছো-নৃত্যশিল্পী দলের সহাবস্থান [গম্ভীর সিং এবং তার দলের নাচের খ্যাতি আন্তর্জাতিক জগতেও এখন পরিচিতি লাভ করেছে] উৎসুক গবেষক মাত্রকেই আকর্ষণ করে। 'পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার পশ্চিমাঞ্চল, বিহারের অন্তর্গত সিংভূম জেলার বাঙলাভাষী ধলভূম মহকুমা, সেরাইকেলা খরশোয়া নামধারী ব্রিটিশ যুগের দেশীয় রাজ্য, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং বর্তমান পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে একত্র করে যদি একটি গণ্ডী টানা যায়, তাহলে সেই গণ্ডীর মধ্যস্থ অঞ্চলকে 'ছো-নাচে'র রঙ্গভূমি বলা যেতে পারে। এই রঙ্গভূমির কোথায়, কখন, কবে ছো-নাচের উদ্ভব ঘটেছিল সে বিষয়ে গবেষণা করার দরজা এখনও খোলা' ['ছো' একটি গ্রামীণ নৃত্যকলা—সুধীর করণ। দেশ, ৩০।১০।৭১]। সুতরাং মুখোশ শিল্পের পটভূমির রূপটি জানার জন্য, প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য, আগ্রহী ব্যক্তিরা সমুৎসুক একথা বলা বাহুল্য।

'১৯৫৫ সালে ষ্টেটস রি-অরগ্যানাইজেশন কমিটির সুপারিশে ওই বছরের নভেম্বর মাসে পুরুলিয়া, বিহারের মানভূমের কোল ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় যুক্ত হল আর একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে। পশ্চিমবাংলার মোটামুটি সমতল ভূখণ্ডে পুরুলিয়া কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এনেছে। রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে পুরুলিয়া আয়তনে পঞ্চম। আবহাওয়ায় বিহারী ঝাঁঝ। ২৪০৭ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আছে অসম্ভব দারিদ্র্য, ভীষণ অস্বাস্থ্য। ১৬১০৫৭৭ জন মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি, পশুপালন এবং জঙ্গল আহরণ। শিল্প, অর্থনীতি এবং কৃষিতে এই জেলা দারুণ অনগ্রসর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এই জেলার এখনও তেমন কোন অবদান নেই। কিন্তু লোক সংস্কৃতিতে এই জেলা যে ঐশ্বর্য সংযুক্ত করেছে তার জন্য আমরা গর্বিত হতে পারি'। [দেশ, ২২ আষাঢ়, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে]। এই জেলারই ১৪৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত থানা বাগমুণ্ডীর আয়তন হোল ১৭২ বর্গমাইল। এর উত্তরে ঝালদা এবং আরসা থানা, পূর্বে বলরামপুর থানা এবং সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ জুড়ে বিহার। বাগমুণ্ডী থানা কেন্দ্র থেকে চড়িদার অবস্থান মাইল ছয়েক পশ্চিমে। চড়িদার উত্তরে পাহাড় আর তিনদিকে চাষাবাদ যোগ্য জমি, চড়িদা তথা বাগমুণ্ডীর শৈলমালায় যে শিলাস্তর বিদ্যমান ভূ-তাত্ত্বিকের ভাষায় তার নাম হোল আর্চিয়ান এবং গঞ্জোয়ানা। অর্থাৎ পৃথিবীর আদিমতম শিলাস্তর দিয়ে বাগমুণ্ডীর শিলাস্তর গঠিত। এই হচ্ছে 'থান' বাগমুণ্ডী তথা চড়িদা গ্রামের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত। চড়িদার ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানের বা পরিবেশের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে এর পুরুষালী চরিত্র। এই পুরুষালী প্রভাব লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

'ছো' অথবা 'ছৌ'—নাচের নামকরণ এবং শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে প্রচণ্ড মতভেদ আছে। কোন বিশেষজ্ঞ বলছেন, 'না, ছো-নয়, কোন কারণেই 'ছো' নয় নিছক ছ'-এ ও'-কার।' ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেলার বিবৃত ওড়িয়া উচ্চারণ রীতিতে 'ছো'-কে বলা হয় ছও বা ছোউ। আবার অর্থের ব্যাপারেও এখবিধ মতভেদ আছে। কেউ বলছেন সংস্কৃত 'ছায়া' শব্দ থেকে ছৌ, কেউ বলছেন 'ছদ্ম' শব্দ থেকে 'ছৌ' শব্দের উৎপত্তি, কেউ বা মন্তব্য করছেন 'সঙ' শব্দ থেকে 'ছৌ' শব্দটি জন্ম নিয়েছে অন্যেরা বলছেন সৈনিকদের ছাওনি বা ছাউনি থেকে 'ছৌ' এসেছে, কারণ নৃত্যের আঙ্গিক ও চরিত্রে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির অবকাশ আছে প্রচুর।

ছো-নাচ গ্রামীণ নৃত্যকলার পর্যায়ভুক্ত হলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা গাজন বা চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আর গাজনে সঙ সেজে নাচা বা ছদ্মবেশ ধরে নাচা দুটোই হতে পারে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে 'ছদ্ম' কিংবা 'সঙ' শব্দটি থেকেই 'ছো' বা 'ছৌ'-র উৎপত্তি বলে মোটামুটিভাবে মানা যেতে পারে, যদিও গাজন বীরাচারী উৎসব।

'ছো শব্দটি ওড়িয়া ছু-ষ (ছলনা) শব্দেরই সংকুচিত রূপ। 'ছু-অ' শব্দটির ময়ূরভঞ্জী উচ্চারণ কিন্তু ছো বা ছও, সীমান্ত বাঙলার কোন কোন অঞ্চলেও তাই। সং সাজা, ঢং দেখানো প্রভৃতিও এই শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। গাজনের সং কিংবা সং নাচ বললে যা বোঝায়, ছো-নাচ বললেও তাই বোঝায়।' (সুধীর করণ দেশ, ৩০।১০।৭১)

ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে হোল এই কারণে রাজধানী কলকাতা থেকে শ' আড়াই মাইল দূরে গ্রামের পর্ণকুটিরে আবদ্ধ থাকা একটি সজীব শিল্প এবং নৃত্যাঙ্গিক নিয়ে ইদানীংকালে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে।

ছো-নাচ এবং তার মুখোশ শিল্প নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই পূর্বোক্ত গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে নি। জেলা পুরুলিয়ার কয়েকটি স্থানে বান্দোয়ান, বাগমুণ্ডী, আরসা এবং ঝালদা ছো-নাচের কেন্দ্রভূমি হয়ে আছে। ধর্মীয় কাহিনী এবং ধর্মীয় আবেদনের উপর ভিত্তি করেই এ নাচ প্রবহমান। একটা প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবেই ওঠে, এতদিন বাঙ্গালী কলারসিক, অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হয় নি কেন?—সম্ভবতঃ বহুদিন এই অঞ্চল বিহারের অন্তর্গত থাকার ফলে বাঙ্গালী শিল্প রসিকরা এ সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ রাখতেন না।

'ছো-নাচের বিশিষ্টতা হচ্ছে তার মুখোশ। পুরুলিয়া, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যার প্রচলিত নাম 'মুহা' কিংবা 'মহড়া'।…সীমান্ত বাঙলার সর্বত্রই মুখোশ নির্মাণকারী শিল্পীদের সন্ধান পাওয়া যায়। যাঁরাই প্রতিমা নির্মাণের কাজ করেন, তাঁরাই সাধারণত ছো-নাচের মুখোশ তৈরী করে থাকেন।' (সুধীর করণ দেশ, ৩০।১।৭১)। যদিও সুধীরবাবু মন্তব্য করেছেন…সীমান্ত বাঙলার সর্বত্রই মুখোশ নির্মাণকারী শিল্পীদের সন্ধান পাওয়া যায়, তথাপি চড়িদা এবং ডোমরাজি গ্রাম ছাড়া আর কোন মুখোশ শিল্পীগোষ্ঠি, গিল্ড বা কলোনীর সন্ধান আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। অনুরাগী এবং উৎসাহীরা যদি এ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন তবে উপকৃত হই।

মহামুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে নৃত্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে মুখোশ ব্যবহারের প্রসঙ্গ রয়েছে কিন্তু প্রাচীন ভারতে মুখোশ প্রস্তুত প্রণালীর রীতি প্রকরণ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি নি। ভারতের

পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী ও উপজাতিক নৃত্যের ক্ষেত্রে মুখোশ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত থাকলেও, ঐ সব মুখোশের প্রস্তুত প্রণালী ও শিল্প সৌকর্য থেকে চড়িদা স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে বলেই ধারণা হয়। মুখোশ নির্মাণের যে অভিনব পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয় তা ভারতবর্ষে আর কোথাও হয় না।

ডোমরদি এবং চড়িদার মুখোশ তৈরীর মূল উপকরণ হোল : মাটি, মাটির তৈরী ছাঁচ বা মডেল, কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, মিহি পলি মাটি, ময়দা বা চাল-গুঁড়ির আঁটা, শাল বা পেঁপড়ো কাঠের কর্ণিক, পোড়া মাটির কর্ণিক, কোপাল বার্ণিশ, বিভিন্ন প্রকারের উজ্জ্বল রঙ, বেঁজী বা ছাগলের লোমের তুলি, জল, পর্যাপ্ত রোদ ও শুকনো আবহাওয়া ইত্যাদি।

সাধারণভাবে মুখোশ তৈরীর কয়েকটি স্তর বর্তমান। এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের কাজ শেষ হবার পর প্রয়োজনমতো রোদে অথবা ছায়াবৃত স্থানে শুকনো করে তবেই পরবর্তী স্তরের কাজ শুরু করা যায়।

মুখোশ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের নাম 'খাপি' বা 'মাটি গড়া'। এই পর্যায়ে কেবলমাত্র মাটি দিয়ে অভীষ্ট মূর্তির একটি মডেল বা ছাঁচ তৈরী করে নেয়া হয় এই পর্যায়ের কাজের ধরণ অনেকটা কুমোরটুলীর দেবমূর্তি তৈরীর অনুরূপ। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু প্রত্যেক শিল্পী স্বাধীনভাবে ছাঁচ বা মডেল তৈরী করে যেহেতু শিল্পীদের স্বাতন্ত্র্যতা বা শিল্প সৌকর্য মুখোশগুলোতে অনিবার্যভাবে ধরা পড়ে। এক শিল্পীর চিন্তা ভাবনার সাথে অন্য শিল্পীর চিন্তা ভাবনা, হাতের কাজ মায় শেষ তুলির টান পর্যন্ত স্বতন্ত্র হয়ে ধরা দেয় এবং সেটির সূত্রপাত ঘটে এই 'মাটি গড়া' পর্যায়েই।

মাটির মডেলটি রোদে শুখানোর পর তার গায়ে শুকনো ছাইয়ের গুঁড়ো লাগিয়ে তার ওপর ময়দার বা চালের গুঁড়ির সহযোগে তৈরী আঁটার লেই লাগানো পুরানো খবরের কাগজ, ব্যবহৃত বই-খাতার কাগজ ঐ মডেলটির ওপর এমনভাবে সেঁটে দেয়া হয় যাতে চোখ, নাক, কান ইত্যাদির তীক্ষ্ণতা বা স্পষ্টতা আভাসিত হয়। ময়দার আঁটা লাগানো কাগজ চার-পাঁচ পুরু করে লাগানো হয়—এই পর্যায়ের কাজের নাম 'কাগজ আট্‌কান' বা 'কাগজ চিটানো'। কাগজের আবরণটি রোদে অর্ধেক শুখানোর পর মিহি পলিমাটি [যা কাছাকাছি নদীগর্ভ থেকে সংগৃহীত হয়] দিয়ে ছোটখাট খাঁজ ইত্যাদি ভর্তি করে দেয়া হয়—যাতে মূল মডেলের অনুরূপ নিখুঁত হয়ে দাঁড়ায় এবং এই পলিমাটির ওপর ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি লেপে দেয়া হয়। [কাপড়ের টুকরোগুলোকে পূর্বাহ্নে কাদাজলে ভিজিয়ে রাখা হয়।] এরপর কাঠের কর্ণিক দিয়ে মূল মডেলের অনুরূপ আদল আনার জন্য পালিশ করা হয়। এই পর্যায়ের নাম 'কাপড় সেটানো'। কাপড় সেটানোর পর পোড়া মাটির অথবা কাঠের কর্ণিক দিয়ে নিখুঁতভাবে পালিশ করা হতে থাকে—যাতে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি না থাকে। এর নাম 'খাপি পালিশ' বা প্লেন করা।

খাপি পালিশ করা মুখোশগুলি রোদে শুখানোর পর মূল মডেলটি থেকে মুখোশটিকে ছাড়িয়ে আনা হয় এবং এই কারণে অধিকাংশ সময়েই মূল মডেলটিকে ভেঙ্গে ফেলতে হয়—সম্ভবতঃ সেই কারণেই এই পর্যায়ের নাম 'খুঁড়ে তোলা'। এইভাবে মুখোশের আকৃতি দেয়া হয়, তারপর এক প্রস্থ খড়িমাটির গোলা লাগানো হয়। খড়িমাটির গোলা লাগানোর পর আসে মুখোশ রঙ করা ও

সাজানোর পালা—রঙ-তুলি দিয়ে চোখ-মুখ-নাক-ভ্রু-গোঁফ ইত্যাদি আঁকার পালা। মুখোশ সাজানোর জন্য তারের কাঠি, পাখির পালক, রাংতা, পুঁথি, সলমা চুমকি, শন, পাট, রঙ, তুলি বার্ণিশ ইত্যাদি লাগে আর লাগে শিল্পীর দক্ষতা। এ কাজটি যথেষ্ট ধৈর্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। বিশেষভাবে সাজানো আড়ম্বরবহুল মুখোশের নাম পঞ্চখিলান মুখোশ।

মুখোশ নির্মাণের স্তরভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক নামকরণের কিছু পার্থক্য চোখে পড়েছে। দেখা হয় নাই এর লেখক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিতভাবে স্তরভেদ নামকরণ সংগ্রহ করেছেন—(১) মাটি গড়া, (২) কাগজ চিটানো (৩) কাবিজ লেপা (৪) কাপড় সেটানো (৫) খাপি পালিশ (৬) মুখোশ সাজানো। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় নিম্নলিখিত নামকরণ পাওয়া যাচ্ছে—(১) মাটি গড়া (২) কাগজ চিটানো (৩) কাবিজ লেপা (৪) কাপড় সেটানো (৫) খাপি পালিশ (৬) খুশনি খোঁচা (৭) কাবিজ লেপা (৮) সাজান। কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফোকলোর-এর তরফে গত অক্টোবর ১৯৭২-এ চড়িদাতে মুখোশ শিল্পের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে শিল্পী নকুল দত্তের কাছ থেকে নিম্নলিখিতভাবে পর্যায় অনুযায়ী নামকরণগুলি পেয়েছি—(১) খাপি (২) কাগজ আটকান (৩) গঠন করা (৪) চাকান (৫) প্লেন করা বা পালিশ করা (৬) খুঁড়ে তোলা (৭) কিনিকা বা মুখোশ সাজান। আবার ১৯৬১ সালের পুরুলিয়া জেলা সেন্সাস হ্যাণ্ডবুকে দেখা যাচ্ছে—(১) চিটা মাটি—preparation of model with clay (২) ছাই মাখানো—spraying ordinary ash (৩) চিটা মাটি—spreading one layer of liquid clay ইত্যাদি নামকরণ।

চড়িদার মুখোশ শিল্প যে বেশ উন্নত মানের এবং তার শিল্প সৌকর্যও যে বেশ আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জক তার প্রমাণ আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন ডিরেকটর অফ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃক পরিচালিত হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হওয়ার মাধ্যমে। শিল্পীরা বেশ কয়েকবার পুরস্কার অর্জনে সমর্থ হয়েছেন নীচের তালিকাটি তার প্রমাণ—

সুচাঁদ সূত্রধর	—১৯৬৩ খ্রীঃ	—২য় পুরস্কার
অনিল সূত্রধর	—১৯৪৪ খ্রীঃ	—১ম পুরস্কার
ঐ	—১৯৭০ খ্রীঃ	—১ম পুরস্কার
ঐ	—১৯৭১ খ্রীঃ	—১ম ও ২য় পুরস্কার

চড়িদাতে এ শিল্পের প্রচলনের ব্যাপারে একটি কাহিনী চালু আছে। প্রায় ২০০-২৫০ বছর আগে বাগমুণ্ডীর তদানীন্তন রাজা রঘুনাথ সিং-এর এক মাতুল সেরাইকেলার রাজদরবারে চাকরী নেন। ছো-নাচের ব্যাপারে সেরাইকেলার নামডাক যথেষ্ট। শিল্পীরা সেখানে রাজ্যানুকূল্য লাভে উপকৃত। সেখানে বাগমুণ্ডীর ঐ মাতুলটি ছো-নাচের কলাকৌশল শেখে এবং বাগমুণ্ডী ফিরে এসে বাগমুণ্ডী রাজদরবারে ছো-নাচ দেখায়। সেরাইকেলার রাজাদের ন্যায় বাগমুণ্ডীর রাজদরবারও আগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব নিলেন। ঐ সময় শিমুল গাছের কাঠ দিয়ে ছো-নাচের মুখোশ তৈরী হোত। কাঠের মুখোশ ভারতের অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে বিশেষতঃ উপজাতীয় নৃত্যকলায়, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র যাদুর ক্ষেত্রে কাঠের মুখোশের প্রচলন আছে। প্রথম পর্বে ছো-নাচের

মুখোশ কেমন ছিল তা আজ আর জানা যায় না, কেন না তার কোন নিদর্শন কোথাও আছে বলে শুনি নি। যাই হোক, কাঠের মুখোশ তৈরীর প্রথা পূর্বভারতে নতুন কিছু নয়। দানীন্তন বাগমুণ্ডী রাজন্যবর্গ বর্ধমানের বড়তলা পাড়া থেকে দক্ষ তক্ষণশিল্পী বা সূত্রধর আনিয়েছিলেন আপনাপন প্রয়োজনের খাতিরে। সেইসব তক্ষণশিল্পীরা প্রথম প্রথম সিমুল জাতীয় গাছের কাঠ দিয়ে মুখোশ তৈরী করতেন কিন্তু ঠিক কবে থেকে বর্তমান পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও অনুসৃত হতে শুরু হয় তা সঠিক জানা যায় না। অবশ্য আজকের দিনেও দেখা যায় প্রবীণ মুখোশ শিল্পীদের অনেকেই দক্ষ তক্ষণশিল্পী এবং পদবী শীল, দত্ত ইত্যাদি থাকলেও সাধারণভাবে সূত্রধর নামেই পরিচিত। আজকের সূত্রধরদের কোন এক পূর্বপুরুষ বর্তমান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ফলে কাঠের মুখোশের প্রচলন ছো-নাচের ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে যায়।

যেহেতু ছো-নাচ পৌরাণিক কাহিনীকেন্দ্রিক, সেহেতু মুখোশগুলিও পৌরাণিক চরিত্রানুরূপ। বিশেষতঃ মহাদেব, মা দুর্গা লক্ষ্মী, রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, সীতা, সুগ্রীব, তারকাসুর, তাড়কা রাক্ষসী, তরণী সেন, বালী, মহীরাবণ, কংস, ঘটোৎকচ, ইত্যাদি যথেষ্ট জনপ্রিয়, এছাড়া, রাজকুমার, সাঁওতাল-সাঁওতালী, বিভিন্ন জীবজন্তু যথা ভালুক, সিংহ, হরিণ ইত্যাদির মুখোশও তৈরী হয়। সাধারণতঃ এক একটি মুখোশের দাম হয় পাঁচ-ছ'টাকা, কিন্তু বিশেষভাবে অলঙ্কৃত পঞ্চখিলান মুখোশের বিক্রয় মূল্য ৪০/৪৫ টাকা পর্যন্ত হয়। আর অভিনয়ের গুরুত্ব হিসাবে 'পালা সেট'-এর দাম হাজার টাকা অবধি হয়।

মুখোশের বর্ণনির্বাচনে কতকগুলি বিধিবদ্ধতা আছে। যেমন রামচন্দ্র-এর মুখোশের রঙ বা বর্ণ নীল থাকে বলা হয় নবঘনশ্যাম। এর একটা গূঢ় অর্থ আছে।—'আকাশ পৃথিবী আবৃত করিয়া আছে, যেন অঙ্কে ধারণ করিয়া আছে। সেই পৃথিবী ধারণকারী আকাশের বর্ণ নীল : অতএব পালন কর্তা বিষ্ণুর বর্ণও নীল—তাঁহার দুইটি অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রের গাত্রবর্ণও নীল'। মুখোশ শিল্পীরা প্রতীকের অর্থ না বুঝতে পারেন, কিন্তু বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কনভেনশন্ মেনে চলেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

মুখোশ শিল্প যথেষ্ট পরিশ্রম সাপেক্ষ হলেও, শিল্পীদের মতে বিক্রয় মূল্য আশানুরূপ নয়, তাই বছরের সাত আট মাস রাঁচী, হাজারিবাগ, পাটনা, গয়া, বালিয়া, সম্বলপুর, রায়পুর, রাউরকেল্লা—বলতে গেলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে দুর্গা, কালী, বিশ্বকর্মা, গণেশ, সরস্বতী মূর্তি তৈরীর অর্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। শিল্পীদের বক্তব্য প্রায় দশ-বার বছর আগেকার খরিদ্দারেরা এখনও বেঁচে আছেন। নতুন খরিদ্দার, নতুন বাজার বা বিপণন কেন্দ্রের অভাবে 'প্রোডাকশন' বাড়ছে না, কিন্তু আগেকার থেকে 'প্রোডাকশন কষ্ট' বেড়েছে। ছেঁড়া চট, টুকরো কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, রঙ সব কিছুরই দাম বেড়েছে কেবল বাড়েনি নিজের পারিশ্রমিকটুকু। মুখোশ শিল্পের নতুন নতুন বাজার খোঁজা এবং বিক্রীবাটার নিশ্চয়তার জন্য প্রায় বছর বার আগে 'চড়িদা ডলস্ অ্যাণ্ড টয়েস হ্যাণ্ডিক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলেও তার কাজ বর্তমানে বন্ধ, ঋণদান স্থগিত, যদিও অনেকে বলেন—চড়িদাতে ১৭ জন সভ্যকে নিয়ে যে সমবায় সমিতিটি গঠিত হয়েছিল তা শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হলে সমবায়ের মাধ্যমে যে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য তাঁরা পেতেন তা

হারানোর জন্য বিব্রত বোধ করতেন; 'ছো-নাচের মুখোশের বিপুল চাহিদা যখন সীমিত সংখ্যক কয়েকটি পরিবার মিটিয়ে থাকেন তখন তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন না হওয়ারই কথা' [দেখা হয় নাই : চড়িদা—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; দেশ, ১।১।১৯৭২] কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানকালে জানতে পারলাম—১৯৭১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজিওন্যাল হ্যাণ্ডিক্রাফটসের প্রদর্শনীতে বোম্বাই থেকে প্রায় এক লাখ মুখোশের অর্ডার পাওয়া যায় কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধন, যোগাযোগ, ট্রান্সপোর্টের অভাবে অর্ডার বাতিল হয়ে যায়। সমবায় সমিতির চিত্র পশ্চিমবঙ্গে তেমন উজ্জ্বল নয়—তার ব্যতিক্রম এখানেও ঘটে নি। বিপণনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হলে এই হস্তশিল্পটি বিদেশী মুদ্রা আহরণ করতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের হয়েছে, কারণ শিল্পীরা কেবলমাত্র মুখোশ তৈরী করেন না—সুরুচিপূর্ণভাবে ঘর সাজানোর নয়নমনোহর শিল্পদ্রব্যাদিও তৈরী করতে পারেন মুখোশ অনুসৃত পদ্ধতিতে, যা রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা আহরণ করতে পারলে শিল্প এবং শিল্পীদের অবস্থা উন্নত হতে পারে, কিন্তু সম্যক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব কোন কোন মহলে থাকার জন্য শিল্পদ্রব্য আভ্যন্তরীণ বাজারের উপরেই নির্ভরশীল। এই অবস্থার প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

ঋণপঞ্জী :—

শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া।

শ্রীসুবোধকুমার বসুরায়, সম্পাদক 'ছত্রাক', নড়িহা, পুরুলিয়া।

শ্রীবিরিঞ্চি মোহন দে, সহকারী শিক্ষক, বাগমুণ্ডী হাইস্কুল, পুরুলিয়া।

শতবর্ষ পূর্বে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা ও অভিনীত নাটক

মঞ্জু ঘোষ

নাটকাভিনয় তথা নাট্যসাহিত্য জাতি ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং সহৃদয় 'সামাজিক' এদের পরস্পর নির্ভর সহযোগিতার ফলেই নাটক সাহিত্য ও শিল্পরূপে একটা স্থায়ী মূল্য পেয়ে থাকে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সংস্পর্শে বাঙালীর যে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটল তার সবচেয়ে সার্থকরূপ পরিস্ফুট হতে দেখা গেল বোধহয় নাটক ও নাট্যশালার মধ্যে। জনচিত্তে আনন্দ দান করবার জন্য যাত্রা, কবি গান, পাঁচালী প্রভৃতি যে সব শিল্প-মাধ্যম আবহমানকাল ধরে চলে আসছিল—বিদেশী শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে তা তাল মিলিয়ে চলতে পারল না। নূতন শিক্ষায়, নূতন ভাবুকতাবশে মানুষ আনন্দ পাবার ও নূতনতর পথের সন্ধান করতে লাগল। নাট্যশালা স্থাপিত হলো—নাটকের অভিনব রস 'সামাজিকে'র মনে সন্তোষ এনে দিল।

প্রথমে বিদেশী নাট্যামোদী ব্যক্তি, যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা যুদ্ধ নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা অবকাশ বিনোদনের জন্য নাট্যশালার অভাব অনুভব করলেন। আঠার শতকের প্রায় মাঝামাঝি কলকাতার প্রথম ইংরেজী থিয়েটার ও তার সংলগ্ন একটি নাচঘর স্থাপিত হয়।১ এরপর মিসেস্ ব্রিন্টো, মিষ্টার মরিস, হোরেস হেম্যান উইলসন, মেরেডিথ পার্কার, জে, এইচ ষ্টোকলার প্রভৃতিদের চেষ্টায় বহু বিদেশী নাট্যশালা কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এখানে ইংরেজী নাটক, ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনীত হতো এবং প্রায় সমস্ত দর্শক-ই ছিলেন ইংরেজ।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেরালিম লেবেডফ নামক একজন রুশীয় প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয় করান। কিন্তু দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সঙ্গে এর কোন যোগ ছিল না; তাই তা স্থায়ী হতে পারলো না। লেবেডফের ইংলণ্ড গমনের পর-ই তা লুপ্ত হয়ে যায়। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বাংলা নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কিছু তরুণ ইংরেজী কাব্য-নাটকের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতার ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখতে যেতেন এবং সকলেই ইংরেজী ধরনে বাংলা নাটক অভিনয় করাবার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই ইংরেজী শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁদের গৃহ প্রাঙ্গণে নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ ডিসেম্বর বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত হয় সেক্সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে।২ এই সমস্ত নাটকের অভিনয়ের উপর হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। এরপর-ই কলকাতায় যে নাট্যশালা৩ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় না করিয়ে বাংলা নাটক অভিনয় করান হলো।

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় না করিয়ে বাংলা নাটক অভিনয় করান হলো। ক্রমে প্যারীমোহন বসু, আশুতোষ দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতিদের চেষ্টায় তাঁদের গৃহপ্রাঙ্গনে আরও কয়েকটি নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে নিয়মিত বাংলা নাটকের অভিনয় হতো। অবশ্য এইসব নাট্যশালার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না—মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের মধ্যেই সেই আনন্দভাণ্ডার সীমাবদ্ধ ছিল। সেইজন্যই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হলো, নাট্যভারতী জনগণের সম্মুখে এসে তাঁর অবগুণ্ঠন মোচন করলেন।

এই সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন কয়েকজন নিঃসম্বল যুবক—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এরাই সেকালের বিখ্যাত অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বস্তুত, এদের অভিনয়ের গুণেই সাধারণ নাট্যশালা অসাধারণ অভিনয় কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তখন অভিনেতারূপে সুনাম অর্জন করেছেন এবং এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রথমদিকে তিনি যোগ দেন। কিন্তু মত পার্থক্যের জন্য শেষ মুহূর্তে তিনি এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দেননি। কয়েকমাস পরে অবশ্য এই নাট্যশালা যখন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় তখন তিনি এখানে যোগ দেন এবং শক্ত হাতে হাল ধরেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হলেও উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে অনতিবিলম্বে তা ভেঙ্গে পড়ে। আসলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হবার মুখে প্রথম সুরক্ষিত সাধারণ নাট্যশালার সূচনাই হয়েছিল কিন্তু ১৮৭৩-ই সেই স্মরণীয় বছর, যখন নানা ভাঙাগড়া ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য আন্দোলন, স্থায়ী ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ভূমিটি ধীরে ধীরে অধিকার করে নেয়। বস্তুত ঐ বছর থেকেই নানামুখী নতুনত্বের সঞ্চার ক্রমশ ঘটতে থাকে। আলোচ্য সময়ের নাট্যশালা, অভিনেতা—অভিনেত্রী, নাট্যকার ও নাটক, সংযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং সহৃদয় 'সামাজিক' এর দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে এ'বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী, শনিবার, ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হলো 'নবীন তপস্বিনী।' বাংলা সাধারণ নাট্যশালার তালিকায় এই ন্যাশনাল থিয়েটার-ই তখন একমাত্র জায়গা জুড়ে। এর কিছুদিন পরেই অবশ্য ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নামে আর একটি সাধারণ নাট্যশালা গড়ে ওঠে। পরে এ' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। 'নবীন তপস্বিনী'র প্রধান অভিনয়াংশে সেদিন ছিলেন—অর্দ্ধেন্দুশেখর—জলধর, অমৃতলাল বসু—বিজয়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—মল্লিকা, ক্ষেত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও—কামিনী। এই অভিনয়ের প্রায় একমাস আগেই কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার—প্রথম সাধারণ নাট্যশালারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম দিনই অভিনীত হয়েছিল 'নীলদর্পণ'। এই অভিনয় দেখে সমস্ত দর্শক প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'নীলদর্পণ' ছাড়া ১৮৭৩-এর ৪ঠা জানুয়ারীর পূর্বে ন্যাশনাল থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক৬' ও 'সধবার একাদশী৭' এই দু'খানি নাটক অভিনীত হয় মধুসূদন সান্যালের৮ বাড়িতে। তখন ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রতি শনিবার অভিনয় দেখানো হতো এবং জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সব নাটক-ই দীনবন্ধু মিত্রের। ১৫ই জানুয়ারী থেকে শনিবার ছাড়াও প্রতি বুধবার প্রহসন ও বিভিন্ন প্যাণ্টোমাইম অভিনীত হতে থাকে।

ইউরোপীয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাংলার রঙ্গভূমিতে প্যাণ্টোমাইম এই প্রথম প্রদর্শিত হলো। মধ্যস্থ[১৯] পত্রিকায় এই অভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য—

'জাতীয় নাট্যসমাজ—বিগত ৩রা মাঘ, বুধবার, জাতীয় নাট্যালয়ে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র অভিনয় 'কুব্জার কুঘটন', 'নব বিদ্যালয়', মুন্সফি সাহেবের তামাশা এবং 'পরীস্থান' প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সর্বাগ্রে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র অভিনয় হইল।...তাঁহাদিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল, কেবল মাঝে মাঝে একটু আদ্‌টু দোষ ছিল।'

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র রাজীব লোচনের ভূমিকায় অভিনয় করেন অর্ধেন্দুশেখর। পরের শুনিবার অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারী নূতন কোন নাটকের অভিনয় হলো না। 'নবীন তপস্বিনী'র পুনরভিনয় হলো। এই সময়ের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে প্রধানত দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলি-ই সাধারণ নাট্যশালার আদরের সামগ্রী। রামনারায়ণ তর্করত্ন[১০] ও মধুসূদন দত্ত[১১]—এই দুইজনই তখন নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোন নাটক এই সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হতে দেখি না।

এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষদের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের মীমাংসার জন্য নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে নিয়ে একটা কমিটি স্থাপিত হয়। কমিটির ঐকান্তিক চেষ্টায় তখনকার মতো সব মিটে গেল। এর-ই মধ্যে ২২ শে জানুয়ারী, বুধবার যথারীতি অভিনয়ও হলো রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসন ও কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম। এই প্রথম রামনারায়ণ প্রহসনের মাধ্যমে সাধারণ নাট্যশালায় প্রবেশ করলেন। বিবাদ মিটে যাওয়ার পর 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ নাট্যশালার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে যুক্ত হলেন। ২৫ শে জানুয়ারী রামনারায়ণের 'নব নাটক'[১২] অভিনীত হলো ন্যাশনাল থিয়েটারে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেন অর্ধেন্দুশেখর।

দীনবন্ধু মিত্র ও রামনারায়ণ ব্যতীত আর একজন নতুন নাট্যকারের নাটক ৮ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। নাটকের নাম 'নয়শো রূপেয়া'—নাট্যকার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ। সমসাময়িক সমস্যা কন্যা বিক্রয়ের একটা নিষ্ঠুরতার ছবি এই নাটকটিতে অঙ্কিত হয়েছে। প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অপূর্ব অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন—

'নয়শো রোপেয়ার 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটির (অর্ধেন্দুর) অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।[১৩]

পরের সপ্তাহে[১৪] 'জামাই বারিক' এর পুনরভিনয় এবং 'ভারতমাতা[১৫]' নামে একটি রূপক নাট্যের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে দর্শকরা কিরূপ মোহিত হয়ে পড়েন তার বিবরণ পাওয়া যায় অমৃতবাজার পত্রিকা[১৬] হতে—

'ন্যাশনাল থিয়েটার।—গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটারে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারতমাতার একটি দৃশ্য' প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি

যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন পঞ্চ শতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃবর্গের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল।'

এবার ন্যাশনাল থিয়েটার মধুসূদনের নাটক ধরলেন। স্থির হলো 'কৃষ্ণকুমারী[১৭]'-র অভিনয় হবে। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করবেন গিরিশচন্দ্র। বিজ্ঞাপনে কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিজের নাম রাখতে রাজী হলেন না। বিজ্ঞাপিত হলো: ভীমসিংহ—By a distinguished amateur। ২২ শে ফেব্রুয়ারী 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হলো। নাট্যকার মধুসূদন দত্তও এসেছিলেন অভিনয় দেখতে। সকলের অভিনয় দেখে তিনি সুখ্যাতি করলেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর সুন্দর অভিনয় দেখে মাইকেল এত খুশী হন যে তাঁকে কোলে তুলে নাচতে নাচতে বললেন—Krishna kumari you have done to perfection[১৮]।

'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয়ের কয়েকদিন পর ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। অধ্যক্ষদের মধ্যে যে মনোমালিন্য প্রথমে দেখা দিয়েছিল তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ৮ই মার্চ সায়াল বাড়িতে ন্যাশনাল থিয়েটার-এর শেষ অভিনয় হলো 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ[১৯]', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল ও কতকগুলি প্যাণ্টোমাইম। অভিনয় শেষ হলে বিহারীলাল বসু নারীবেশে ফুট লাইটের পিছনে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি গান[২০] গেয়ে দর্শকদের কাছ হতে সাময়িকভাবে বিদায় প্রার্থনা করেন। এবং এ আশ্বাসও দেন—

নির্যাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়।[২১]

অভিনয় বন্ধ হবে শুনে দর্শকগণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অমৃতলাল বসু বলেছেন—'গান শেষ হইল। দর্শকগণ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন।...সকলেই বলিলেন—'কেন তোমরা বন্ধ করবে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদের ভুলব কেন? যেখানে অভিনয় করবে আমরা আসব বৈ কি২২।'

নাট্যশালা ও অভিনেতাদের প্রতি দর্শকদের যে প্রচুর সহানুভূতি ছিল উপরের উক্তি হতে তা প্রমাণিত হয়।

এই থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে অমৃতলাল বসু বলেছেন—'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছুদিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।...কিসে গোলমাল বাঁধিল এখন ঠিক বলিতে পারিব না; টাকা-কড়ির খরচপত্র লইয়া মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গেল২৩।'

ন্যাশনাল থিয়েটার কয়েকজন নিঃসম্বল যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। টাকা-কড়ির ব্যাপারটা তখন প্রধান ছিল না; অভিনয়-ই প্রধান ছিল। কিন্তু টিকিট বিক্রী করে প্রচুর টাকা যখন হাতে এলো তখন ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল তো বাঁধবেই। ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে ঐ প্রসঙ্গে বলেছেন—'Director নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর বেশীদিন থিয়েটার রহিল না,..। ইহার

প্রধান কারণ নগেন, অর্ধেন্দু ও অমৃত তিনজন মিলিত হইয়া আমাকে ও তাহাদের মধ্যে লইয়া চারজন Proprietor declaration দিতে চাহিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, বলিলাম, সকলে খাটিয়াছি—অন্য সকলকে চাকর বা আমাদের অধীন করিব তাহা কখনও হইবে না।' থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। নগেন, অর্ধেন্দু ও অমৃত একদিকে আর আমি অপর দিকে। অবশিষ্ট যত লোক সব আমার পক্ষ অবলম্বন করিল।"২৪

ন্যাশনাল থিয়েটার দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতিরা দৃশ্যপট, স্টেজ সংক্রান্ত ও কিছু অর্থ নিয়ে গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। গিরিশচন্দ্র "এই ভগ্নাংশটিকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে রেজিষ্টার করিয়া লইলেন।"২৫ গিরিশচন্দ্র এইভাবে প্রকাশ্যে একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

দ্বিতীয় দলের কর্তা হলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর দলে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা পোষাক-পরিচ্ছদগুলি নিয়ে নতুন থিয়েটার খুললেন; নাম দিলেন 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' গিরিশচন্দ্রের 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নতুন করে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের কথা ঘোষণা করলেন। এই নাটকের অভিনয় হলো টাউন হলে। ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা নামে লব্ধ প্রতিষ্ঠ একজন চক্ষু চিকিৎসক পাথুরিয়াঘাটায় গঙ্গার ধারে এ-দেশীয় গণের চিকিৎসার নিমিত্ত 'নেটিভ হস্‌পিটাল', বর্তমানে 'মেয়ো হাসপাতাল' স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এই কথা স্থির হয় যে, উনি 'টাউন হল' ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন এবং ন্যাশনাল থিয়েটার সে রাত্রির বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ ওই হাসপাতালের নির্মাণকল্পে দান করবেন। ২৯শে মার্চ 'নীলদর্পণের' অভিনয় হলো। থিয়েটারে সাহায্য রজনীর (Benefit night) এই প্রথম সূত্রপাত ২৬ ২৯শে মার্চের অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের' দাতব্য বিভাগের সাহায্যার্থে টাউন হলে দ্বিতীয় বার২৭ সাহায্য-রজনী করেন। এবার অভিনীত হলো 'সধবার একাদশী।' টাউন হল থেকে স্টেজ তুলে ন্যাশনাল থিয়েটার রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট মন্দিরে স্টেজ খাটান এবং ১২ই এপ্রিল 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেন।

২৬শে এপ্রিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'২৮ ও মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা' —এই দুটি প্রহসন অভিনীত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় ২য় ১০ই মে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ওই দিন অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র এটিকে নাটকাকারে পরিবর্তিত করেছিলেন। বাংলা থিয়েটারে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার প্রথম গৌরব গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য।২৯ সাধারণ নাট্যশালায় এখন থেকেই (১৮৭৩, ২৬শে এপ্রিল) দীনবন্ধু, রামনারায়ণ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া অন্য নাট্যকারদের নাটক অভিনীত হতে থাকে।

ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'হিন্দুন্যাশনাল' দলও অভিনয় শুরু করে। লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে ৫ই এপ্রিল এই দল মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও কতকগুলি প্যাণ্টোমাইম অভিনয় করে। পরের সপ্তাহে হিন্দু ন্যাশনাল দল ১২ই এপ্রিল, শনিবার, 'বিধবা-বিবাহ৩০' নাটকের অভিনয় করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার এই সময় সাধারণত দীনবন্ধু ও মধুসূদনের

একই নাটকের পুনরাভিনয় করে চলছিল। কিন্তু হিন্দু ন্যাশনাল বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় নতুনত্ব আনার জন্য অন্য নাট্যকারের নতুন নাটকের অভিনয় করেন।

অপেরা হাউসে কয়েকটি নাটকের অভিনয়ের পর কালীসিংহের একটি হল ভাড়া করে হিন্দু ন্যাশনাল দল স্টেজের প্লাটফরম বাঁধতে লাগলো। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল হিন্দু ন্যাশনাল দল হাওড়া বেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণের' অভিনয় করেন। কলকাতায় তখন গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল দলের-ই জমজমাট অবস্থা; তাই মে মাসের গোড়ার দিকে এই দল ঢাকায় যায়। ঢাকার বাঁধা ষ্টেজে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁরা অভিনয় করেন। অমৃতলালের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়।

'ঢাকা সহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম। নবাব বাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনীবাবুর কনসার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল; সহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাশিনী, পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। এক রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।"৩১

এই দল ঢাকায় 'নবনাটক' প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাটকের অভিনয় করেন।

ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল দলের আসর জাঁকানোর খবর পেয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারও ঢাকায় গেলেন। অমৃতলাল বসু বলেছেন—"আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন।...দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসর লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না।৩২" গিরিশচন্দ্র এই দলের সঙ্গে ঢাকা যাননি—কলকাতাতেই রয়ে যান। ঢাকায় ৭।৫ রাত্রি অভিনয়ের পর অভিনেতারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁরা আসর গুটিয়ে চলে আসেন।

১৮৭৩-এর জুনের শেষে দুইদল-ই কলকাতায় ফিরে এলেন। এবার দু'দলের অভিনেতাগণ একত্র হয়ে দু'বার অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের প্রথমটি হয় দীর্ঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং দ্বিতীয় অভিনয় হয় মধুসূদন দত্তের৩৩ অল্পবয়স্ক সন্তানদের সাহায্য কল্পে। এই দ্বিতীয় অভিনয়ের বিজ্ঞাপন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়৩৪ দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়—

"We are requested to announce that in the course of the next week The National Theatre gives a perfomance of Krishnakumari for the benefit of the orphans of the lamented author. The object is highly laudable and we hope there will be a large audience on the occasion. We are glad to state that Baboo Ardhendu sikar Mustafi and some other excellent actors have rejoined the company."

১১ই জুলাই এই অভিনয় হয়। অভিনয় উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র মহাকবির উদ্দেশ্যে একটি গীত৩৫ রচনা করেন।

এরপর ন্যাশনাল থিয়েটার ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতার বাইরে অভিনয়কে জনপ্রিয়

করার উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার মুর্শিদাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থানে এবং হিন্দু ন্যাশনাল কলকাতার আশেপাশে চুচুঁড়া প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করতে থাকেন। এই দুই দল নাটকের অভিনয় করলেও এঁদের 'নীলদর্পণ' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়-ই জনসাধারণের কাছে বেশী আকর্ষণীয় ছিল।

১৮৭২-এর ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার দু'তিনমাস পরেই অর্থাৎ ১৮৭৩-এর প্রথমদিকে আর একটি সাধারণ নাট্যশালা কলকাতায় অভিনয় দেখাতে শুরু করে। এই নাট্যশালার নাম 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার'। এই নাট্যশালারও নিজস্ব কোন বাড়ি ছিল না। ২২২ নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্রদেবের বাড়ীতে এই নাট্যশালার অভিনয় শুরু হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী মাধব' ।৩৬ কিন্তু এই নাটক জনসাধারণকে মোহিত করতে সক্ষম হয়নি। এডুকেশন গেজেটের৩৭ সংবাদ হতে জানা যায়—"এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট নাটক আমরা সে দিবস একেবারে পদদলিত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। সে দিবসে অভিনেতৃবর্গের মধ্যে বোধহয়, কেহই 'মালতী মাধবে'র কোন অঙ্গ সুচারুরূপে অভিনয় করবার উপযুক্ত নহেন।..... আমরা কেবল সে দিবস সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছটাও অভিনয় প্রস্তাব অতি উত্তম দেখিয়াই সৌৎসুক্যচিত্তে দেখিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অভিনয় স্থানে যদিও অধিক জনতা হয় নাই (বোধহয় ২০০ হইবে) তথাপি এরূপ গোলমাল হইয়াছিল, যে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।" এই থিয়েটার ২৯শে ফেব্রুয়ারী মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা' নাটক অভিনয় করেন।

১৮৭৩ এর ১৫ই মার্চ ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে আর একটি অভিনয়৩৮ হয়। এরপর এই নাট্যশালা কর্তৃক অপর কোন অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের কৃতিত্ব সে যুগে খুব একটা বেশী নয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুকরণেই এই থিয়েটার গড়ে ওঠে। সুদক্ষ অভিনেতা না থাকার দরুন এই থিয়েটার কিছুদিন পরে-ই নষ্ট হয়ে যায়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি সাধারণ নাট্যশালা নানা সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেয়। এই নাট্যশালার নাম 'বেঙ্গল থিয়েটার'। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ এরপর ন্যাশনাল থিয়েটার যখন কিছুদিনের জন্য অভিনয় বন্ধ করে, সেই সময় হইতে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছিল। সে সময়ের বিখ্যাত ধনী সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ছিলেন এর ম্যানেজার। শরৎচন্দ্র ঘোষ নিজে ছিলেন একজন সুদক্ষ অভিনেতা, সান্যাল বাড়ির ন্যাশনাল থিয়েটারের তিনি ছিলেন নিয়মিত দর্শক। আর এই থিয়েটারের সাফল্যে-ই অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হন। এতদিন পর্যন্ত কলকাতার কোন সাধারণ নাট্যশালার-ই নিজস্ব বাড়ী ছিল না। শরৎচন্দ্র-ই লুইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের৩৯ আদর্শে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করান। মধুসূদন এই থিয়েটারের অভিনয় সম্বন্ধে দর্শকদের আরও আগ্রহী করে তোলার জন্য বললেন—"তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক৪০ রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।"৪১

সেকালে থিয়েটারে মেয়েদের নেওয়া খুব দুঃসাহসিক কাজ ছিল কারণ বারাঙ্গনা ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকদের অভিনয়ের জন্য পাওয়া যেত না। কিন্তু মাইকেলের বৈপ্লবিক প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত করলেন শরৎচন্দ্র। সুষ্ঠু পরিচালনা ও পরামর্শের জন্য শরৎচন্দ্র একটি কার্য-নির্বাহক-সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন। কিন্তু মাইকেলের প্রস্তাবে নাট্যশালায় বারাঙ্গনা আনার কথা হলে সমাজের নীতিহানি ও অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি এই সমিতির সদস্যপদ হতে সরে আসেন। হিন্দু পেট্রিয়ট, ভারত সংস্কার, অমৃতবাজার, মধ্যস্থ প্রভৃতি সমকালীন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় মতবাদের ঝড় উঠলো। শরৎচন্দ্র কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে স্থির রইলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে এলেন চারজন অভিনেত্রী—শ্যামা, গোলাপ, এলোকেশী ও জগৎতারিণী।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারের পাদ প্রদীপের আলো জলে উঠলো। মাইকেলের সম্মানদের সাহায্যকল্পে উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত হলো 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। পরের সপ্তাহেও ওই একই নাটকের পুনরভিনয় হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র৪২ বিবরণ হতে জানা যায়—

'কলিকাতায় বেঙ্গল থিয়েটর নামে আর একটি থিয়েটর স্থাপিত হইয়াছে। তথায় গত দুই শনিবারে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। থিয়েটর কোম্পানী অভিনয়ার্থ বৃহৎ একখানি গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস পুরুষ দ্বারা স্ত্রীর অংশ সকল সম্পাদিত হয় না। বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ এইটি পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের দলে দুইটি স্ত্রীলোক প্রবিষ্ট করাইয়াছেন।..... অভিনেতৃগণের মধ্যে যযাতি ভিন্ন অপর সকলেই উত্তম অভিনয় করিয়াছিলেন।...আমরা অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি।'

সমালোচনা যাই হোক 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বেঙ্গল থিয়েটারের ঈপ্সিত সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হয় নি। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে বেঙ্গল থিয়েটারে সুদিন এলো। তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং এলোকেশী নামে একজন গৃহস্থ বধূকে কেন্দ্র করে দেশে তখন তুমুল আন্দোলন চলছিল। শরৎচন্দ্র দেশের অবস্থা বুঝে লক্ষীনারায়ণ দাস রচিত 'মোহান্তের এই কী কাজ !!'৪৩ নাটকের অভিনয় শুরু করলেন। সমকালীন ঘটনার জীবন্ত ছবি দেখতে বেঙ্গল থিয়েটারে দর্শক ভেঙে পড়তে লাগলো। বেঙ্গল থিয়েটারের এই অবস্থা বর্ণনা করে অমৃতলাল বসু বলেছেন—

'বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না, শেষ বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন, মোহান্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নী বধ করলেন, কে একজন বাঙালী' (কৃষ্ণান বোধহয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। আমি আর নগেন উপরি-উপরি দু'রাত্রি টিকিট কিনতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।.....নারী এক্ট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে করছিল, মোহান্ত-মাহাত্ম্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শতশত লোক ফিরে যেতে লাগলো।'৪৩

এই নাটকে মোহান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।৪৫ এরপর বেঙ্গল থিয়েটারের সুনাম বেড়ে চললো। অভিনীত হলো রামনারায়ণের 'চক্ষুদান',৪৬ বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী,৪৭ 'রত্নাবলী',৪৮ 'কৃষ্ণকুমারী'৪৯। এই সময়ে সাধারণ নাট্যশালার প্রথম নাট্যকার

দীনবন্ধু মিত্র মারা যান।৫০

বেঙ্গল থিয়েটারে যখন পুরোদমে অভিনয় চলছে তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের দল চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। এইখানেই 'মোহান্তের এই কি কাজ!!' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে ভুবন-মোহন নিয়োগী৫১ টিকিট না পেয়ে ফিরে এলেন। স্থির করলেন স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তুলতে হবে। ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল ঐ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দিলেন। অমৃতলাল বলেছেন—

বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শতশত লোক ফিরে যেতে লাগল।

আমরা দম ফেটে মারা যেতে লাগলুম; টাকার ঝনঝনানি শুনে নয়, সত্য বলছি—টাকা তখন ডোণ্ট কেয়ার; থালি বাড়ি নেই—ষ্টেজ নেই, এ্যাকট করতে পারছি না বলে, হাততালির শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতে পারছি না বলে।'৫২

ভুবনমোহন অর্থ দিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হলো। ধর্মদাস সুর এই নাট্যশালা প্রস্তুত করান।

১৮৭৩-এর হিন্দু ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতায় ফিরে এসে সাম্বৎসরিক উৎসব করেন। এই সভায় ভাষণ দেন নাট্যকার মনোমোহন বসু। উৎসব শেষে অভিনীত হয় হরলাল রায়ের 'হেমলতা'৫৩ নাটক। এই নাটকের অভিনয় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হয়।

কলকাতায় ফিরে এসে হিন্দু ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে মিশে যায়। মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যাশনাল থিয়েটার নামে স্বতন্ত্র রইলেন। পরে অবশ্য ভুবনমোহনবাবুর একান্ত আগ্রহে দুটি দল একত্র হয়ে যায়।

১৮৭৩-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর যে গ্রেট ন্যাশনালের ভিত্তি স্থাপিত হয় তার নির্মাণকার্য তিনমাস পরে শেষ হলে ৩১শে ডিসেম্বর ওই নাট্যশালায় অভিনয় হবে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। নাটকের নাম 'কাম্যকানন'। এই নাটক প্রসঙ্গে অমৃতলাল বলেছেন—

'আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা কয়েকজন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটক-ই বলুন আর Fairy Tales-বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম।'৫৪

কিন্তু এই নাটকের অভিনয় শেষ হতে পারে নি। মঞ্চে আগুন ধরে যাওয়ায় অভিনয় অসমাপ্ত রয়ে যায়। দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে অপর একদিন তাঁদের বিনামূল্যে অভিনয় দেখানো হবে।

এইভাবে দেখা যায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ভাঙাগড়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দুটি শক্তিশালী সাধারণ নাট্যশালা গড়ে উঠেছে।—বেঙ্গল থিয়েটার ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। বেঙ্গল থিয়েটার সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরে কলকাতার নাট্যামোদী জনসাধারণের মনে আনন্দ দান করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার-এ ক্ষমতা ও টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হেতু কর্তৃত্ব ক্রমাগত বদল হয়েছে তবু গ্রেট ন্যাশনাল দলও বহু বৎসর নাট্যরসপিপাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। যতদিন না আর কোন শক্তিশালী নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল ততদিন পর্যন্ত এই দুটি দল বেঙ্গল থিয়েটার ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কৃতিত্ব ও স্থায়িত্ব বিষয়ে নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগিয়ে

চলেছে। নাট্যশালাকে এই দুটি প্রতিষ্ঠান শুধু প্রমোদ কেন্দ্ররূপে দেখেন নি, জাতীয় জীবনের তীর্থক্ষেত্রেও পরিণত করেছিলেন।

১। অমল মিত্র—কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়, পৃঃ ৪

২। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'-ই ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজর' নাটকের অংশ বিশেষ ও উইলসন কর্তৃক অনূদিত 'উত্তমরাম চরিত' এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়।

৩। শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়ীতে এই নাট্যশালা স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়।

৪। সে সময় সাধারণ নাট্যশালায় কোন অভিনেত্রী নেওয়া হতো না। মেয়েদের পাট' ছেলেরাই করতেন। অবশ্য বাংলা নাটক অভিনয়ে এর পূর্বে লেবেডফ স্ত্রী-ভূমিকা মেয়েদের দ্বারাই করেছিলেন। নবীন বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় কালেও (১৮৩৫ খ্রীঃ অক্টোবরে) বিদ্যার ভূমিকায় 'রাধামণি', মালিনীর ভূমিকায় 'জয়দুর্গা' ও বিদ্যার সখীর ভূমিকায় 'রাজকুমারী' নামে কয়েকজন স্ত্রীলোক নেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ নাট্যশালায় ক্ষেত্র গঙ্গোপাধ্যায় চমৎকার মেয়েদের পার্ট করতেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের 'সরলা'-র ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রচুর প্রশংসা পান।

৫। ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর।

৬। অভিনীত হয় ১৮৭২, ১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার।

৭। " " " ২৮শে " " ।

৮। এইখানেই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর থেকে সাধারণ নাট্যশালা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ৪৲ টাকা ভাড়ায় প্রথম অভিনয় দেখাতে শুরু করে; কারণ তখনও পর্যন্ত নাট্যশালার কোন নিজস্ব বাড়ি ছিল না।

৯। মধ্যস্থ ১২৭৯, ৬ই মাঘ।

১০। রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন কুল সর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রথম অভিনীত হয় নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে পরে আরও ২।৩ জায়গায় অভিনীত হয়। রামনারায়ণের 'নব নাটক' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারী। নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণের তখন প্রচুর খ্যাতি। তাঁর 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষু দান' ও 'উভয় সংকট' প্রহসন সাধারণ নাট্যশালার পূর্বেই পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে বহুবার অভিনীত হয়েছিল।

১১। ১৮৫৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' প্রথম অভিনীত হয়। ওই নাট্যশালার এই নাটকটি এক বছরের মধ্যে ছয়বার অভিনীত হয়। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক যথাক্রমে ১৮৫৫ সনের ১৮ই জুলাই ও ১৮৬৭ সনে ৮ই ফেব্রুয়ারী অভিনীত হয়।

১২। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এই নাটকের অভিনয়ে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন অক্ষয় মজুমদার।

১৩। 'নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' পৃঃ ৬।

১৪। ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৩।

১৫। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই রূপক নাট্যটির রচয়িতা।

১৬। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩।

১৭। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী, শোভাবাজারে দেবী কৃষ্ণের বাড়িতে প্রথম 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হয়।

১৮। ইন্দ্রমিত্র—সাজঘর, পৃঃ ৩৪।

১৯। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জুলাই কাঁশারি পাড়ার কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়ীতে এই প্রহসনটি প্রথম অভিনয় হয়।

২০। গানটির প্রথম লাইন—কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।

সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলো না আমায় ॥

২১। বিপিনবিহারী গুপ্ত (সঃ) অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা/পুরাতন প্রসঙ্গ/পৃঃ ২৪০।

২২। তদেব/পৃঃ ২৪০।

২৩। তদেব/পৃঃ ২৩৭—২৩৮

২৪। 'নাট্যমন্দির' ভাদ্র, ১৩১৭ পৃঃ ১০২—১০৩।

২৫। বিপিন বিহারী গুপ্ত (সঃ) পুরাতন প্রসঙ্গ | পৃঃ ২৪১

২৬। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় | 'গিরিশচন্দ্র' পৃঃ ১২৬

২৭। অভিনয়ের তারিখ ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩।

২৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম রচনা; প্রকাশ কাল ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২। প্রথম এখানেই অভিনীত হয়।

২৯। শঙ্কর ভট্টাচার্য্য | কলকাতার থিয়েটার, দ্বিতীয় পর্ব পৃঃ ৭

৩০। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে কয়েকটি নাটক রচিত হয়। উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বিধবা বিবাহ' নাটক ওই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার'-এ ১৮৫৯, ২৩শে এপ্রিল।

৩১। বিপিন বিহারী গুপ্ত (সঃ) পুরাতন প্রসঙ্গ, | পৃঃ ২৪৪—৪৫

৩২। তদেব পৃঃ ২৪৫

৩৩। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন রোগভোগের পর মধুসূদন পরলোকে গমন করেন। তাঁর স্ত্রী আগে-ই সংসারের বন্ধন হতে মুক্তি পান। তাই তাঁর শিশু সন্তানদের দেখার কেউ ছিল না।

৩৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০ই জুলাই, ১৮৭৩।

৩৫। গীতটির প্রথম লাইন—কে রচিবে মধুচক্র, মধুকর বিনে।

মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে ॥

৩৬। পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে ১৮৬৯ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম এই

নাটকের অভিনয় হয়।

৩৭। এডুকেশন গেজেট—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩।

৩৮। অভিনীত নাটক 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'চক্ষুদান' প্রহসন।

৩৯। দি, ডাবলিউ, লুইস নামক একজন ইংরেজ প্রতি বৎসর শীতকালে সেক্সপীয়র ও ও অন্যান্য খ্যাতনামা নাট্যকারের নাট্যলীলা অভিনয় করে দেখাতেন। তাঁর স্ত্রী মিসেস্ লুইস ছিলেন একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। সুলতানা নামে একজন শুঁড়ি ভাড়া পাবার আশায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের কাছে একখানি থিয়েটারের ঘর তৈরী করে দেয়। করগেটের চাল, করগেটের বেড়া; সেখানেই লুইস-দম্পতি তাঁদের অভিনয় দেখাতেন। এই থিয়েটারে বাড়িটি সেকালের অভিনেতাদের কাছে আদর্শ স্বরূপ ছিল। ঐ সম্পর্কে অমৃতলাল মাসিক বসুমতী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখেছেন—"মনে মনে ভাবতেম, গড়ের মাঠের ঐ টিনের বাক্সটি বোধহয় দেশী কভেন্ট গার্ডেন। হঠাৎ কোন আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে আমরা যদি বাঙালীটোলায় ঐরকম একটা বাড়ী গ'ড়ে তুলতে পারি, এইটে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতুম।"

৪০। নাক রচনা করে দেন 'মায়াকানন'।

৪১। বিপিন বিহারী গুপ্ত (সঃ) পুরাতন প্রসঙ্গ | পৃঃ ২৪৬

৪২। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮শে আগষ্ট, ১৮৭৩।

৪৩। অভিনয়ের তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর।

৪৪। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

৪৫। বেঙ্গল থিয়েটারের সূচনা থেকেই ইনি যুক্ত ছিলেন। ইনি একাধারে নট, নাট্যশিক্ষক, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে এঁর জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এঁর মৃত্যুর (১৯০১, ২০শে এপ্রিল) অব্যবহিত পরেই বেঙ্গল থিয়েটারও লুপ্ত হয়।

৪৬। অভিনয়ের তারিখ—৫ই অক্টোবর, ১৯৭৩।

৪৭। অভিনয়ের তারিখ ২০শে অক্টোবর, ১৮৭৩। এই অভিনয়ে শরৎচন্দ্র জগৎসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় জলজ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে ষ্টেজে এসে দর্শকদের চমক লাগিয়ে দিতেন। বেঙ্গল থিয়েটারই 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করে বঙ্কিমচন্দ্রকে জনসাধারণের কাছে বেশী পরিচয় করিয়ে দেন।

৪৮। অভিনয়ের তারিখ—২২শে নভেম্বর, ১৮৭৩।

৪৯। „ „ ২৯শে নভেম্বর, ১৮৭৩।

৫০। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর।

৫১। সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ধনী রসিকমোহন নিয়োগীর পৌত্র। এই ব্যক্তির সাহায্যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়।

৫২। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪। ৫৩। অভিনয়ের তারিখ ১৩ই ডিসেম্বর।

৫৪। বিপিন বিহারী গুপ্ত (সঃ) পুরাতন প্রসঙ্গ | পৃঃ ২৪৮

৫৫। ১৮৭৪ এর ১৮ই মার্চ দর্শকদের বিনামূল্যে নবীন তপস্বিনীর অভিনয় দেখানো হয়।

কবিতীর্থ বর্ধমান

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলা দেশ কবির দেশ। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, পারিপার্শ্বিক শোভা, বিচিত্র আবহাওয়া, নানা উৎসবে পূর্ণ বারো মাসের জীবনযাত্রা—সবই যেন কেমন ছন্দোময়, কেমন যেন কাব্যিক। তাই হয়তো এ দেশের মাটিতে অজস্র কবি জন্ম নিয়েছেন। কত কবি, কত বিচিত্র তাঁদের কাব্য! বাংলা দেশে ছাড়া অন্য কোন দেশ হলে এসব কবিদের নাম এত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হত না।

বাংলা দেশ যেমন কবির দেশ, বর্ধমান জেলা তেমনি কবির জেলা। বর্ধমানের মাটিতে বাংলা সাহিত্যের বহু খ্যাতিমান কবি জন্ম নিয়েছেন, সেদিক থেকে এ জেলা একটি পুণ্যতীর্থ! বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর এবং মঙ্গলকাব্যের-জয়ানন্দ-লোচন দাস-মুকুন্দরাম থেকে শুরু করে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সকলেই এ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

পদকর্তা জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন কাঁদড়া গ্রামে। এই গ্রামে বসেই তিনি তাঁর সুললিত ছন্দে লেখেন—

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্ক মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
আজু পেখনু মুই বিদগধ নারী।
মদন বান কত গেলি উভারি॥
কেশ বিথারল পিঠহি লোল।
মাথ আথ পর রহল নিচোল॥

নরহরি চক্রবর্তী রচিত "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে জ্ঞানদাসের পরিচয় লেখা আছে—

রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥

জ্ঞানদাস ছাড়া এই গ্রামে মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দও জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীখণ্ড গ্রামটি তো বৈষ্ণব পদকর্তাদের আবির্ভাবে একটি তীর্থস্থান হয়ে আছে। গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ, নরহরি দাস, আত্মারাম দাস—সকলেই এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এসব পদকর্তাদের পদগুলি বাংলা কাব্যের এক একটি সম্পদ। কার পদ যে কার পদের চেয়ে অধিকতর মধুর যে কোন স্বিতধী পাঠককে এ সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হতে হয়। জ্ঞানদাস যেখানে বলেছেন—

গৌররূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি ধূঞা বুকে, সে রস মানস সুখে,
অনিমেষ দেখহ নয়ানে॥

বলরাম দাস সেখানে বলেছেন—

রাতিদিনে চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি সাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
ঘরে বিদগ্ধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥

বিপরীত দিকে জগদানন্দ তো প্রাণ আকুল করে তুলেছেন তাঁর পদ লালিত্যে—

মধু বিকচ কুসুম পুঞ্জ, মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ,
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ, মালতী ফুল মালে রঞ্জ
অঞ্জন-যুত কঞ্জ নয়নী, গঞ্জন, গতিহারী॥

আত্মারাম দাসও যে কেমন মধুর পদ রচনা করতেন, তার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে—

অঞ্জন গঞ্জন, লোচন রঞ্জন, গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত থলত পুন, পুন উঠি গরজন, চাহিনি বক্ষ নয়ান॥

নরহরি দাস সাধারণত নরহরি ঠাকুর বলেই পরিচিত। তাঁর ভক্তামৃত-অন্টক- ভক্তি-চন্দ্রিকা পাটল প্রভৃতি বাংলা দেশে তথা কাব্যের স্থায়ী সম্পদ।

পড়ান গ্রামে জন্ম কবিশেখর রায়শেখরের। তাঁর-পদগুলিতে যেন মৃদঙ্গের ছন্দ বেজে চলেছে—

মধুর মধুর গৌর কিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর মধুল বাজত, মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান॥

গোবিন্দ দাস ছিলেন কর্মকারের ছেলে। তিনিই কিন্তু কড়চা লিখে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন। বর্ধমান জেলার কাঞ্চন নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যেও আশ্চর্য কুশলতার পরিচয় মেলে— কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্যভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু হাঁসিউতি চায়॥

শ্রীখণ্ডের ন্যায় কুলীন গ্রামও বাংলা দেশের অনেক খ্যাতিমান কবির জন্ম দিয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অমর অনুবাদক মালাধর বসু, তাঁর পৌত্র রমানন্দ বসু ছাড়াও কবি পরমানন্দ সেনও এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ছন্দে শ্রীচৈতন্য শতক চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত অনুরাগী পদকর্তা শিবানন্দ সেনেরও জন্ম হয় এই গ্রামে।

অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের জন্ম দেহুর গ্রামে। জয়দেবিন্দ দাসের জন্ম দেবীপুরের কাছে বেনাগ্রামে এবং বর্ধমান-মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত সাধক কমলাকান্তের জন্ম হয় অম্বিকা কালনা গ্রামে। তাঁর স্থললিত পদগুলি শাক্ত সাধনার জগতে আজও অমর হয়ে আছে। জয়গোবিন্দ সনাতন গোস্বামীর সংস্কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত বাংলায় অনুবাদ করেন স্থললিত ছন্দে। অম্বিকা-কালনা 'বাচস্পত্য অভিধান' রচয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতিরও জন্মস্থান।

মাড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 'রাম রসায়ন' রচয়িতা রঘুনন্দন গোস্বামী। রাম রসায়ন গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

বর্ধমান সন্নিধান, গ্রাম মাড়ো অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস।

পদকর্তাদের ন্যায় মঙ্গলকাব্যের অমর স্রষ্টারাও অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ দুই কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর দুজনেই এই জেলার যথাক্রমে দামুন্যা এবং পেঁড়ো-বসন্তপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া ধর্মমঙ্গল রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী ও রূপরাম চক্রবর্তীও জন্মগ্রহণ করেন এই জেলায়। খণ্ডঘোষের কাছে কৃষ্ণপুরে জন্ম ঘনরামের এবং রূপরাম চক্রবর্তীর জন্ম শ্রীরামপুর গ্রামে।

চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন জামাইপুরা গ্রামে। চৈতন্য মঙ্গলের আর-এক শ্রেষ্ঠ কবি লোচনদাসের জন্ম হয় কোগ্রামে। কাব্যে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লোচন দাস বলেছেন—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস॥
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥

এরই কোগ্রামেই জন্ম কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের।

চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন কাটোয়া থানার ঝামাটপুরে। কাটোয়ার কাছে বাঁধনুড়া গ্রামও বিখ্যাত হয়ে আছে বিখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায়ের জন্মস্থান হিসাবে। কাটোয়ার কাছে সিঙ্গী গ্রামও মহাভারতের অমর কবি কাশীরাম দাসের জন্ম দিয়ে ধন্য হয়েছে। কাশীরামের অগ্রজ 'জগৎমঙ্গল' রচয়িতা গঙ্গাধর দাসও এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বর্ধমান জেলার চুপীগ্রাম বিখ্যাত বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁর পৌত্র ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মস্থান হিসাবে। অধুনা বিস্মৃত গীতিকার দেওয়ান রঘুনাথ রায়ও জন্মগ্রহণ করেন এই চুপী গ্রামে। তাঁর পদগুলিও মনোহর—

কে শরোপরে রূপসী বিহরে-
মুখমণ্ডলে জগৎ আলো করে।
কালী কি করালী রাধা চন্দ্রাবলী
অনুমান নাহি হইল রে॥

রাবণবধ, রামবনবাস, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পালার অবিস্মরণীয় স্রষ্টা মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন তাতশালা গ্রামে। কালনার কাছে বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সজনীকান্ত দাসও তাঁর মাতুলালয় বেতালবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়-এর জন্মস্থান রামচন্দ্রপুর। সোএাই গ্রাম ধন্য হয়েছে বিদুষী মহিলা হটি বিদ্যালঙ্কারের জন্ম দিয়ে। 'ফুলজানি' রচয়িতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ন'পাড়ায়। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে ইনি অমর হয়ে আছেন।

বাংলা সাহিত্যের 'পঞ্চানন্দ' রসরাজ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন কাটোয়ার কাছে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। ব্যঙ্গাত্মক কাব্যে তাঁর দক্ষতার কথা সর্বজনবিদিত। রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে জন্ম প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের। তাঁর রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা সুবিখ্যাত। 'গোবিন্দ সামন্ত' রচয়িতা বেভারেণ্ড লালবিহারী দের জন্ম তালপুর গ্রামে। অগ্নিবীণার বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া এবং কবিশেখর কালিদাস রায়ের জন্মস্থান কড়ুই গ্রাম বিখ্যাত।

ইতিহাস ঘাঁটলে স্বল্পখ্যাত আরও অনেক কবির সন্ধান হয়তো পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের এত সংখ্যক কবি এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন—এটাই এ জেলার গৌরব। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বে এমন একটি জেলার সন্ধান পাওয়া যাবে না নিশ্চয়ই—যে-জেলায় এত কবির জন্ম হয়েছে। কবিদের জন্মস্থান পরবর্তীকালের ইতিহাসে তীর্থস্থানরূপে সম্মানিত হয়—সেদিক থেকে সমগ্র বর্ধমান জেলাই কবিতীর্থ!

অসমীয়া সাহিত্যের স্রষ্টা শঙ্করদেব

পরমেশ রায়

সম্প্রতি শঙ্কর দেবের জন্মতিথি আসামের সর্বত্র সাড়ম্বরে পালিত হল। প্রত্যেক বছরে এরকম হয়ে থাকে। ছোট বড় ধনী দরিদ্র সব বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা তাদের মহৎ পুরুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে বরগীতে, অংকীয়া-নাটে, কীর্তনে। বস্তুত ধর্মপ্রচারক হিসেবেই আপামর জনসাধারণ তাঁকে বছর বছর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে।

অবশ্যই শঙ্করদেব মূলতঃ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক। চৌদ্দ পনের ষোল শতকের রামানন্দ, কবীর, বল্লভাচার্য, নামদেব, চৈতন্যদেবের মতই শঙ্করদেব ঐ সময়ের একজন ধর্মপ্রচারক। শঙ্করদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ভারতের অন্যসব প্রদেশের মতই আসামও কি রাষ্ট্রনৈতিক কি সামাজিক—সব দিক দিয়েই ছিল অস্থির, বিশৃংখল। বরং অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানকার মাৎস্যন্যায় অবাধ ছিল। আসাম তখন রাজনৈতিকভাবে অনেকাংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কাছাড়ি কোচ চুতিয়া তুঁইঞা অহোমরা তখন আসামের এক এক অংশ দখল নিয়ে নিয়েছিল। ফলে অসমীয়া জনসাধারণের মধ্যে কোন কিছুরই ঐক্য ছিল না। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখড়দের তখন প্রাণ রাখাই সমস্যা যেখানে, সেখানে সংস্কৃতি বা ধর্মের ঐক্য থাকবারও কথা নয়। এই ডামডোলের বাজারে বামাচারী তান্ত্রিকরা প্রভাবশালী হয়ে বসেছিল। যৌন ব্যাভিচার, ধর্মের নামে নরবলি দেয়া, মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীদের নাচ তখন অবারিত ছিল। এমনি সময়ে শঙ্করদেবের আবির্ভাব।

কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারক বললে শঙ্করদেবের আসলে যে-পরিচয়ের জন্য ধর্মমতনির্বিশেষে আজও সকলেই তাঁর জন্মতিথি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে তা বলা হয় না। আসলে শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্মপ্রচারকের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচার কেবল একটা বিশেষ ধর্মান্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না, ধর্মকে কেন্দ্র করে অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজ পরিবর্তনের উত্তরোল সেই প্রথম শোনা গিয়েছিল। ধর্ম যে কেবলমাত্র খোলস নয়, কেবলমাত্র আচারসর্বস্ব জিনিষ নয়, তা যে ভাষা সমাজের সংগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তা যে সব মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার মূলে প্রোথিত, শঙ্করদেব তাঁর জীবনব্যাপী ধর্মসাধনায় সেই কথাই বলে গেছেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মদর্শন নিয়ে কঠিন কঠিন বাণী দেন নি বা দিয়ে থাকলেও তা অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণের উদ্দেশ্যে নয় এবং বাণী দিয়েই সারাটা জীবন অতিবাহিত করেন নি। আসলে তাঁর নয়া-বৈষ্ণবধর্ম কি করে সহজ স্বাভাবিকভাবে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের উপাদেয় করে তোলা যায় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর রচনাবলীতে। ফলে একই সংগে দুটো কাজ হয়ে গেল—ধর্মপ্রচার করা আর অসমীয়া ভাষাকে উন্নত করা। অসমীয়া ভাষাকে উন্নত করার অনেক নূতন মাধ্যম তাঁর হাতে রূপ পেল। সে কথায় পরে আসছি। অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির জন্য তিনি যে, ধর্মপ্রচারক হয়েও, পৃথক যত্ন নিয়েছিলেন সেইটেই লক্ষ্য করবার বিষয়। তাই কেবলমাত্র একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁকে বছর বছর প্রণাম জানিয়ে লাভ নেই, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির উন্নতির জন্য এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য তাঁর যে অবদান সেই কথাটাই বছর বছর

কেন, সবসময়ই অসমীয়া জনসাধারণ স্মরণ করতে পারে। সেই অবদান কিভাবে কতটা অসমীয়া সাহিত্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে, তাই-ই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখবার মত।

নওগাঁর কাজে আলিপুখুরি গ্রামের ভূঁইঞা পরিবারে ১৪৪৯ সালে শঙ্করদেবের জন্ম। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে লেখাপড়া শেষ করেন। বিয়ের চার বছর পর তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে তিনি বৈষ্ণবধর্মের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হন। ফিরে এসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং তাঁর বাসস্থান বড়দোবায় স্থানান্তরিত করেন। এইখানেই প্রথম তিনি তাঁর নয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। সেখানে 'শত্র' খোলেন, 'নামঘর' প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন থেকেই বিশৃংখল অসমীয়া জনসাধারণকে এক ধর্মের সূত্রে বাঁধতে শুরু করেন।

শঙ্করদেব গৃহী থেকেই ধর্ম আচরণ করতে বলেছেন। তাঁর ধর্ম-বৈষ্ণবধর্মেরই প্রকারভেদ—একের কাছে নত হওয়া। সেই এক হল বিষ্ণু যিনি বারে বারে আবির্ভূত হয়েছেন নরনারায়ণরূপে। শঙ্করদেব গুরুবাদ মানতেন না। সাধারণতঃ গুরু বলতে যা বুঝি—আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় নিজেকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করা—তা তিনি ছিলেন না। অত্যন্ত সাধারণ লোকের সংগে তিনি অবাধে মিশেছেন, নিজেকে সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই অসাধারণ চারিত্রিক গুণই তাঁকে মহৎ করে তুলেছে। আজ পর্যন্ত তাঁর ফটো পূজো যে শুরু হতে পারে নি সে কেবল তাঁর এই মহৎ প্রভাবেরই ফল বলা যেতে পারে। শঙ্করদেবের ধর্ম, প্রকৃত প্রস্তাবে, তখনকার আসামে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তান্ত্রিকমতের বিরুদ্ধে একটা খোলাখুলি বিদ্রোহ। তিনি তাঁর একশরণ ধর্ম দিয়ে একটা বিহ্বল বিশৃংখল জাতিকে একসূত্রে বাঁধলেন। কাজেই সেইকালে সৎ ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আর প্রমাণ পাওয়া গেল কি করে ধর্মকথা সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য ধর্মপ্রচারকের তুলনায় শঙ্করদেব অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন তা বোধ হয় নিশংসয়ে বলা চলে। শঙ্করদেব যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তার পরিচয় মিলবে তার ভক্তি-রত্নাকর আর অংকীয়া নাটগুলোতে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তাঁর রচনার অধিকাংশই অসমীয়া ভাষাতেই লিখেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে রচনাগুলো অসমীয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই গ্রহণ করতে পারে। অশিক্ষিতরা শুনেই যাতে রসাস্বাদন করতে পারে তেমনি সরল তাঁর ভাষা। এই সব রচনা কেবলমাত্র ভাষার গুণেই অশিক্ষিতদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল এবং এখনও করে থাকে।

মূলত ভাগবত থেকেই তিনি তাঁর রচনার উপাদান খুঁজেছিলেন। ভাগবত, যা পুরাণগুলোর মধ্যে সূর্য বলে বর্ণিত হয়েছে, কোনো প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা সেইকালে সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। ভাষায় অনুবাদ হলে ভাগবতের গুরুত্ব কমে যায়—এই ছিল তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিদান। তাই ভাগবত অনুবাদ করে শঙ্করদেব তৎকালীন ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং এই কারণে কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের দরবারে তাঁকে অভিযুক্তও করা হয়েছিল। তাঁর 'নিমি-নব সিধি সম্বাদ', 'ভক্তি প্রদীপ' প্রভৃতি এবং বিখ্যাত 'কীর্তন' ভাগবত থেকেই নেয়া। মাত্র উনিশ বৎসর

বয়সে তিনি তাঁর কীর্তন রচনা শুরু করেন, শেষ হয় প্রায় তাঁর শেষ জীবনে। বেদান্ত, গীতা পদ্মপুরাণ প্রভৃতিও তাঁর কীর্তন রচনার উপাদান যুগিয়েছে। কীর্তনে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনার সাথে কবিসত্তার প্রতিফলন ঘটেছে। অসমীয়া সাহিত্যে কীর্তনেই প্রথম গদ্য বলা হল। ছন্দোময় ভাষা প্রকাশভংগির চমৎকারিত্বে, আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনায় কীর্তন আজ পর্যন্ত সমস্ত অসমীয়াভাষীদের কাছে আকর্ষণীয়।

অসমীয়া সাহিত্যে মিষ্টিসিজম তাঁর 'বরগীতেই' প্রথম দেখা গেল। বন্ধন নয় মুক্তিই মানবাত্মার কাম্য। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ মায়াময় এবং স্বপ্নের মতই অবাস্তব। একমাত্র ভক্তিই সত্যিক জীবন নির্দেশ করতে পারে। সর্বশক্তিমানের প্রকাশ মানুষের মধ্যেই; আর মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যেই আছে মানুষ ও ভগবানের নিরন্তর যোগ। এই বৈষ্ণবীয় মিষ্টিক ধারণা তাঁর বরগীতে বিশেষভাবে রয়েছে। বরগীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রত্যহ গীত হবার জন্যই রচিত। সেইজন্যেই রাগ-রাগিণীর নির্দেশ দেয়াও রয়েছে। শঙ্করদেবের কবিসত্তারও প্রতিফলন এতে রয়েছে। তার পরিচয় পাওয়া যাবে অহির রাগে গীত হবার জন্য রচিত এই কবিতাটিতে:

লহু লহু বহে মলয়া বায়।
কোকিল তেজে স্থললিত রায়॥
রবি পরশনে তিমির নাশি।
সঙ্গহি বালক সব মিলল আসি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ব্যঞ্জন ভাতে।
পাঞ্চনী শিঙ্গা বেতুবেনু হাতে॥
গো বৎসপাল লেহ সঙ্গে করি।
উঠ গোষ্ঠ চল ঠাকুর মেরি॥

বরগীত ঠিক অসমীয়া ভাষায় রচিত নয়। সেইকালে প্রচলিত ব্রজবুলিতে রচিত এ ব্রজবুলি অসমীয়া-মৈথিলী মিশ্রিত।

শঙ্করদেবের অন্যতম কীর্তি অংকীয়া নাটের প্রচলন। অসমীয়া সাহিত্যে এই প্রথম নাটক রচিত হল। অংকীয়া নাট আসলে এক একটি একাংক নাটক। অসমীয়া-অংকীয়া নাটগুলো সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। এই নাটকগুলোতে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা ভারতের তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসেও নতুন। নাটকে দৃশ্যপট-এর ব্যবহার অংকীয়া-নাটেই প্রথম হল। অংকীয়া-নাটের প্রথম অভিনয় হয় ১৪৬৮ সালে। তখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও এমনকি য়োরোপেও দৃশ্যপট ব্যবহার হয় নি। য়োরোপে সতের শতকের আগে নাকি দৃশ্যপট ব্যবহার হয় নি; In Europe it has been traced out that scenes were not used earlier than the seventeenth century' যদি তাই-ই হয় তবে শঙ্করদেবকে দৃশ্যপট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলক বলতে হবে। প্রথম অভিনীত নাটকে শঙ্করদেব নিজেই দৃশ্যানুযায়ী দৃশ্যপট একে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় মিলবে। কালিয়দমন, পত্নীপ্রসাদ এবং রাসক্রীড়া বা কেলিগোপাল নাটগুলো ভাগবত থেকে নেয়া, রুক্মিনী-হরণ ও পারিজাতহরণ যথাক্রমে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে এবং

রামবিজয় রামায়ণ থেকে নেয়া। অংকীয়া নাটগুলোর প্রভাব আজও অসমীয়া ভাষীদের ওপর আগের মতই সমভাবে বর্তমান। অংকীয়া নাট মূলত দৃশ্যকাব্য। ফলে প্রধানত বৈষ্ণবধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এই নাটগুলো ধর্মমতনির্বিশেষে সকলকেই প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। সংস্কৃত নাটকে সূত্রধর সংস্কৃত এবং নারীচরিত্র বিভিন্ন প্রাকৃতে কথা বলত। বারো শতকের আগে সর্বত্রই নাটকে দুটো ভাষা ব্যবহৃত হত। শঙ্করদেব তাঁর নাটকে কিন্তু সব চরিত্রের জন্যই মিশ্রিত অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করেছেন। নাটকগুলোতে নাচ, গান, কথোপোকথন এবং বাজনা অবশ্যই থাকত। গানগুলোকে সাধারণতঃ 'ভটিমা' বলা হয়। নাটকের ভাষা ব্রজবুলি কাপরূপী সংস্কৃত এবং মৈথিলী মিশ্রিত। অসমীয়া নাটক রচনা যেমন এই প্রথম হল তেমনি নাটকে গদ্যের ব্যবহারও প্রথম হল।

"হে স্বামি কৃষ্ণ! কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পরম পুরুষ পুরুষোত্তম
তুহু জগৎগুরু! তোহাক দ্রোহে করিয়ে পাপী পুত্র নরক
নিজ পাপে নাস গেল। তাহে পুত্র ওহে ভগদত্ত নাতিক
তাহারি পায়ে সমর্পন। আহেক রক্ষা করহ।"

—তাঁর নাটকে ব্যবহৃত এই গদ্য ষোল শতকের গদ্যেরই নিদর্শন।

ছন্দের দিক থেকেও অসমীয়া ভাষায় শঙ্করদেবই প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কাব্যে তিনি যেসব ছন্দ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ছুলারী, ছবি, ঝুমুরি, কুসুম-মালা, ঝুম্বা, চপয়া, হনস-মালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অলংকার ব্যবহারেও তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

পনের শতকের মধ্যভাগ থেকে ষোল শতকের শেষভাগ পর্যন্ত অসমীয়া সাহিত্যে বৈষ্ণবযুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়টুকুতে বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে নানাধরনের সাহিত্য রচিত হয়েছে। আর শঙ্করদেবই এই সব সাহিত্যের মূল হোতা। যেমনটি হয়ে থাকে, ঐ সময়ের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মতই অসমীয়া বৈষ্ণবযুগের সাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। কাব্য নাটক যাই-ই রচিত হোক না কেন ধর্ম প্রচারই ছিল এখানে মুখ্য। কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক হয়েও শঙ্করদেবের সাহিত্যকর্ম যে যুগ অতিক্রম করে আজও অসমীয়া জনজীবন একইভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারছে সেইটেই লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রচারকেন্দ্রিক হয়েও যে সাহিত্য রসাস্বাদযুক্ত হতে পারে তা শঙ্করদেব প্রমাণ করলেন।

নয়াবৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক হিসেবে শঙ্করদেবকে শ্রদ্ধা জানানো উচিত একথা স্বীকার করেও বলা চলে যে কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারক বললে তাঁকে খাটো করে দেখানো হয়। একজন সমাজস্রষ্টা, একজন সাহিত্যস্রষ্টা, একজন ধর্মপ্রবর্তক—সব মিলিয়ে যে শঙ্করদেব তাঁকেই শ্রদ্ধা জানানো উচিত। স্কুল বা কলেজপাঠ্য বইয়ে তাঁর দু'একটা রচনা সংকলন করলেই কর্তব্য শেষ হয় না, তাঁর সমস্ত সাহিত্যকৃতি এমনভাবে আলোচিত হওয়া উচিত যাতে সমস্ত অসমীয়াভাষী তাঁর আবির্ভাবের গুরুত্বটা বিশেষভাবে বুঝতে পারে। সেক্ষেত্রে অসমীয়া বুদ্ধিজীবীমহলের দায়িত্বটা বেশী।

সূত্র :—Sankardeva—A Study—H. M. Das, Assamese Literature—Hem Barua, The Mother Godess Kamakshya—B. K. Kakati, Aspects Early Assmese Literature—G. U. Publication

রুচি বিকার—পূজায়

কিছুদিন আগে পত্রিকান্তরে পাঠকরা পূজার মূর্তি নির্মাণে আধুনিক রীতির বৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করেছিলেন। এক দলের বক্তব্য দেশ, জাতি সব ছেচ্ছাচারের জন্য রসাতলে গেল আর অন্যদল বলেন, না এ নতুন শিল্পকলা।

যাঁরা বলছেন, সব কিছু রসাতলে গেল তাদের কথা বাদ দিচ্ছি, কারণ 'নেতি নেতি' করতে করতে তাঁরা নিজেরাই বিলুপ্ত হতে চলেছেন। কিন্তু যাঁরা বলছেন, মূর্তি নির্মাণের বর্তমান প্রবণতায় নতুনতর শিল্পকলার উন্মেষ ঘটছে, তাঁদের কথা বিচার করে দেখা যাক।

খাদ্যবস্তু দিয়ে গড়া মূর্তি যে শিল্পসম্মত হতে পারে না এমন কথা বলছি না। আমাদের বিয়ের তত্ত্বে, তা সে গাঁয়ে হলুদই হোক আর ফুলসজ্জাই হোক, এমন শিল্পসম্মত সৃষ্টি দেখা গেছে। কিন্তু তা তো তাৎক্ষণিক আনন্দ দানের জন্য। প্রতিমা নির্মাণও যদি সেই জন্যই হতো তাহলে আপত্তির কিছু থাকতো না, কিন্তু যার পূজো হবে তার কতকগুলো বাধা নিষেধ থাকে, যা মানা উচিত।

অনেক বলেন, পূজোটা উৎসব হিসাবে নিলেই হয়। তা নেওয়া কোন ক্ষেত্রেই যখন সম্ভব হয় নি তখন আমাদের ক্ষেত্রেই বা সম্ভব হবে কেন?

যিনি নিজেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেন যত উদারই হোন না কেন, তার পক্ষে নমাজ বা ইদ বা সবেরাতের রীতিতে নড়চড় করা কোনো মতেই সম্ভব নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। একজন খৃষ্টান বা পার্শি কি বাহাই—যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন ধর্মীয় রীতিতে হস্তক্ষেপ তাঁরা করেন না করতে পারেন না। বড়জোর ব্যক্তিগত প্রবণতার দোহাই দিয়ে সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত হতে পারেন। তাহলে আমাদের পূজাসাধনের ক্ষেত্রেই বা যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা চাওয়া হবে কেন?

যাঁরা পূজোর নামে উৎসবের দাবীদার তাঁরাতো স্বচ্ছন্দে শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রমুখ ঋতুরঙ্গের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পূজোর তকমা না লাগালে নগদ নারায়ণের ব্যবস্থা না হবার আশংকা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান তো!

কিন্তু এহো বাহ্য! পূজোর রুচিবিকারের সূচনা মূর্তিবিকার থেকে, কিন্তু শেষ সেখানেই নয়। প্রায় সর্ব বিষয়েই এই রুচি বিকারের প্রকাশ দেখা যায়। আরতি নৃত্যের নামে উদ্দামতা। মাইকে কুরুচিকর হিন্দীগানের প্রচার। সদা সর্বদা পূর্ণ শক্তিতে মাইক চালানো এসব নিয়ে আলোচনা করতে বসলে মহাভারত হয়ে বসবে সুতরাং সে বিষয়ে আভাসমাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

কিন্তু বিসর্জনের শোভাযাত্রায় যে রুচিবিকার দেখা যায় তার উল্লেখ না করে পরা যায় না। যেখানে সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা সহকারে দেবী প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে রুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সুবর্ণ

সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিল সেখানে অশালীন বেশে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যভঙ্গীমার কি অর্থ করা হবে? রুচিবিকার ছাড়া দ্বিতীয় কোন শব্দ দিয়ে কি তাদের মনোভাব বোঝানো সম্ভব।

এরপর আছে নির্দিষ্ট সময়সূচী না মেনে যথেচ্ছভাবে বিসর্জন দেবার বাহানা। সকলের কাজের অসুবিধা ঘটিয়ে, যে কোনদিন বাদ্যভাণ্ডে মেদিনী কম্পমান করে শোভাযাত্রার মধ্যে আর যাই থাক রুচির পরিচয় নেই। আর সুন্দরের আরাধনায় এহেন কুৎসিতের অনুপ্রবেশ পীড়াদায়ক বললে অত্যুক্তি হবে না।

কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, পূজোর সঙ্গে এহেন রুচিবিকার চিরন্তন। হুতোমের বর্ণনায় যে ছবি আছে আজকের দিনে তার থেকে ভিন্নতর কিছু তো দেখা যায় না। সুতরাং যে রুচিবিকার ঐতিহ্যবাহী তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে হুতোমের আমল থেকে আজ পর্যন্ত একই ট্র্যাডিশন চলে আসছে তাহলেও কুরুচিকর বস্তুকে চালিয়ে যাবার পক্ষে তা যথেষ্ট যুক্তি নয়। তদোপরি সে যুগের অকাল কুষ্মাণ্ড ধনী পুত্রদের বেলেল্লাপনা অসহ্য লাগায় সাধারণ মানুষের তরফ থেকে সার্বজনীন দুর্গোৎসব বা সরস্বতী পূজার প্রচলন হয়েছিল বাস্তব প্রতিবাদ করার জন্য। আর তাই প্রথম দিকে হুতোমি রুচির থেকে সরিয়ে এনে পূজোকে রুচিকর করার চেষ্টা দেখা যেত। এখনো কলকাতার প্রাচীন কয়েকটি সার্বজনীনে সেই রুচির ঐতিহ্যের প্রকাশ আজো বর্তমান।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে যে রুচিহীনতার প্লাবন একটু একটু করে আমাদের সমাজকে গ্রাস করতে আরম্ভ করেছিল তারই সর্বগ্রাসী প্রভাবে পূজোর মধ্যেও রুচিবিকার দেখা দেয় আর আজতো তার পূর্ণ বিকাশ।

এ অবস্থায় পরিবর্তন সহজসাধ্য তো নয়ই অধিকন্তু সামাজিক পরিবর্তন সাপেক্ষ। তবে একটা ব্যবস্থা করা হয়তো যায় কিন্তু আগেই বলেছি পূজোর বিরুদ্ধ সামাজিক উৎসবে চাঁদা না দেওয়ার সম্ভাবনা এত প্রবল যে, পূজোর নলচে আড়াল রাখতেই হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই রুচিবিকার মেনে নিতে হবে আর নয়তো সরকারী ডাণ্ডা ঘুরিয়ে পূজোর বিধি নিষেধ মানাতে হবে। শালীন বিসর্জনের শোভাযাত্রা করাতে হবে। এখন যেহেতু সরকারী নির্দেশ পালন করাবে যারা তাদেরও রুচিবান হতে হবে অন্যথায় রুচিবিকার দূর করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নামমাত্র বললে অত্যুক্তি হয় না।

সাত মণ তেল পুড়লে তবে তো রাধা নাচবে।

রবি মিত্র

আ লো চ না

বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা

আজকের সমাজের একটি বিশেষ সমস্যা হল বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা। এই সমস্যাটির বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার স্বরূপটিও বিচার করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা হ'ল কোন ব্যক্তি বিশেষের বা একাধিক ব্যক্তির এমন একটি মানসিক প্রবণতা যা তা'কে বা তাদেরকে সমাজের বৃহত্তর জীবন ধারা থেকে ছিন্ন করে নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে পরিচালিত করে। এই প্রবণতা দ্বারা চালিত হয়ে এরা যে জীবনযাত্রা কর্মধারা অনুসরণ করে তাতে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ এবং রাষ্ট্রই এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মূল লক্ষ্যস্থল এই সমাজ বা রাষ্ট্র একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে আবার তা নাও হতে পারে। বিচ্ছিন্নতাকামীদের কার্যকলাপের পরিধি রাষ্ট্র বা সমাজের ব্যাপ্তি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে সকল দেশেই বিচ্ছিন্নতাকামীদের দেখা পাওয়া যাবে যার জন্যে তত্তৎ রাষ্ট্র বা সমাজের চিন্তিত হবার কারণ আছে।

আজকের যুগে বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা যে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বর্তমানযুগে দু'টি মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে, দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে এবং তার পরেও বেশ কয়েকটি দেশে অন্তর্বিপ্লব ঘটে গেছে তা ছাড়াও আঞ্চলিকভাবে এখানে সেখানে দুই বা ততোধিক জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের ঘটনাও বিরল নয়। এইসব যুদ্ধ বা বিপ্লবের ফলে লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রাণ হারিয়েছে, পৃথিবীর প্রায় এক ষষ্ঠাংশ ভূ-ভাগ বিধ্বস্ত হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর অবশিষ্ট এক বিশাল জনসমষ্টি অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা, ব্যাধি, অশিক্ষা ও ক্ষুধার শিকার হয়েছে। সভ্যতার জয়যাত্রা ও মানুষের শুভ বুদ্ধিকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটিতে যে আনবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল শুধু তার ফলেই এক লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এই নিষ্ঠুরতার ধারার এখনও কি ছেদ পড়েছে? সমসাময়িক ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর উত্তরটি নেতিবাচক।

এই যুগের এই হানাহানির কালগুলিতে এবং অব্যবহিত পরে মানুষের জীবনে দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের ব্যাপক প্রকাশ দেখা দিয়েছে। যে চিরন্তন মূল্যবোধের উপর মানুষের আস্থা ছিল—আত্মরক্ষার নিষ্ঠুর প্রয়োজনে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যেমন করেই হ'ক বেঁচে থাকতেই হবে, অপরের কথা ভাবার প্রয়োজন আমার কি, এই বোধ আজ বহু লোকের মনে জেগে উঠেছে। বৃহত্তর সমাজের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথাই ভাবব এবং নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করব এটাই হল তাদের জীবনের মূল মন্ত্র। এই হল মোটামুটি বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার স্বরূপ। উচ্চকাঙ্ক্ষী ক্ষমতা লিপ্সু রাজনৈতিক নেতা, ধর্মধ্বজী ভণ্ড, মুনাফা লোভী ব্যবসায়ী, নারী লোলুপ

কপট সমাজ সেবী, ভেজাল ঔষধের কারবারী, সরকারী ট্যাক্স ফাঁকিদাতা এবং এদের সাহায্যকারী সকল ব্যক্তিকেই আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ধরে নিতে পারি, কারণ এরা রাষ্ট্র ও সামাজিক স্বার্থের বিরোধিতা করে চলেছে। এ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য স্তরেও এই বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এই কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার দেখা যেত। এখন একটি বৃহৎ পরিবারে সকলের সুখ দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে সমগ্র পরিবারের একত্র বাসের দৃষ্টান্ত বিরল। আগেকার বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার এখন বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে যে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে যে ক্ষুদ্র পরিবার গড়ে উঠেছে সেটিও দৃঢ়বদ্ধ নয়। এই ক্ষুদ্র পরিবারের স্বামী স্ত্রীর জীবনাদর্শ ও আচার আচরণে কোন সমতা নেই, সন্তানদের সঙ্গে তাদের আত্মিক সম্পর্কটুকুও বহু ক্ষেত্রে শিথিল হতে দেখা যাচ্ছে। আজকাল স্বামী-স্ত্রী সন্তান একত্র বাস করেও যেন একে অপরের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এদের সঙ্গে আত্মীয় বন্ধুদের সম্পর্কের কথা না বলাই ভাল। এই আমাদের বর্তমান গার্হস্থ জীবন। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় কিন্তু আগেকার দিনের শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে যে পরমহৃদ্য একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল সেটি আর বড় বেশী দেখা যায় না। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে দুই পক্ষই উদাসীন কাজেই যে শিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে এঁরা জড়িত সেখানে তাই আজ নানা অশান্তি—ছাত্র শিক্ষকে বিরোধ, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ল্যাবোরেটরী, আপিসে আগুন, পরীক্ষার হলে উৎপাত এসব আজকাল প্রায়শই ঘটছে। কোন একটি প্রতিষ্ঠান যেমন আপিস বা কারখানা সেখানেও পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে কোন মানসিক বোঝাপড়ার অভাব দেখা যাচ্ছে সেখানেও ধর্মঘট, ছাঁটাই এবং প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতি এমন কি অবলুপ্তি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মোট কথা হল এই যে প্রায় সকলেই আজ শুধুই নিজের কথা ভাবছে নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ টাই সকলের কাছে বড়। শুধু নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করব তা যেমন করেই হোক—বৃহত্তর সমাজস্বার্থ থেকে নিজেকে পৃথক করে ভাবার এই মনোভাব সমাজের সামনে একটা বৃহৎ চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকে হয়ত বলবেন যে ডারুইনের Survival of the fittest বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন এই তত্ত্বানুযায়ী আমিই যেমন ক'রে হ'ক বেঁচে থাকব এটাই ত জৈব ধর্ম। এঁরা ভুলে যান যে ডারুইন তত্ত্বের এটাই শেষ কথা নয়। 'Origin of Species' গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় একযুগ পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Descent of man' গ্রন্থে ডারুইন দেখিয়েছেন যে মানুষ তার আদিম অবস্থাতেই নিজের স্বার্থেই সমাজবদ্ধ হয়েছিল তখনই সে বুঝেছিল তাকে বেঁচে থাকতে হলে অপর মানুষের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা রাখতেই হবে। সমাজই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই বিশ্বাস, নির্ভরতা, স্বার্থত্যাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতাই মানব সভ্যতার জন্ম দিয়েছে এবং যুগে যুগে তার অগ্রগতি হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই সমাজ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে সামাজিক সহযোগিতাই মানুষকে টিকিয়ে রেখেছে এবং তাকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। জীব বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে মনুষ্যেতর প্রাণী জগতে এমন কি এক কোষী জীবদের মধ্যেও বাঁচার তাগিদে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রবণতা তাঁদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নিজেকে সমগ্র সমাজের

স্বার্থের থেকে বিচ্ছিন্ন না করেও মানুষের পক্ষে ভালভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব এবং সেইটাই হল প্রাকৃতিক নিয়ম। বিশ্ববিধানের মূল কথাই হল শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা এর উল্টোটা সত্য নয়।

যিনি বা যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিচ্ছিন্নতাকামী তাঁদের আমরা অবশ্যই ধিক্কার দিয়ে থাকি। তাঁরা ধিক্কারেরই যোগ্য। বোমা ছুঁড়ে, বন্দুকের বুলেট দিয়ে, লাঠি পেটা করে অথবা জেলখানায় পুরে রেখে আমরা অনেক সময় এদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। এতে কাজ খুব কমই হয়, ব্যাধিটি থেকে যায়। আমরা যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার তাদের বোঝা উচিত বিচ্ছিন্নতাকামী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী—এরা সকলেই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। এই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে সুস্থ পরিবেশ। কিন্তু আজকের সভ্যতায় এই সুস্থ পরিবেশ কোথায়? আজকে আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি সেই একান্ত বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিরিখে সাফল্য বলতে বুঝি আমরা শুধু আর্থিক বা বৈষয়িক সাফল্য। যে মানুষের যত বেশী টাকা সে ততদূর সফল, যে জাতির আর্থিক সামর্থ্য যত বেশী সে তত বেশী সভ্য। আমাদের কাছে যার যত বেশী টাকা সে ততটুকু দামী, তার চরিত্র বা মানসিক সম্পদ যত নিম্নস্তরেই হো'ক না। অন্তরের সম্পদ থেকে বাইরের সম্পদের মূল্য যেখানে বেশী সেই সামাজিক পারিপার্শ্বিকে বেড়ে উঠা মানুষের পক্ষে প্রতিযোগিতা ও সঙ্ঘাতের পথেই এগিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথে পা বাড়ালে যে জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে যাবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে এ বোধ যার জন্মেছে সে কেন এ পথে যাবে? এখন আমাদের এই সভ্য সমাজে দেখতে পাই যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সামাজিক সুখ সুবিধাগুলি এককভাবে ভোগ করেন আর সমাজের একটি বিরাট অংশ অশিক্ষার ব্যাধিও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে। এদের এক বিশাল অংশ পুরুষানুক্রমে মুখ বুজে সহ্য করে যায়। এর অপর অংশ যদি কখনও সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন আমরা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ধিক্কার দি এবং গেল গেল রব তুলি। বহুদিন আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন—

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে,
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

আমাদের মহাত্মা গান্ধী ভারতের অনশন ক্লিষ্ট কটিবস্ত্র পরিহিত অগণিত মানুষের কথা মনে মাত্র রেখে শোষণমুক্ত 'সর্বোদয়' সমাজের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন আজও স্বপ্ন রয়ে গেল, সে স্বপ্ন রূপায়িত করার দায়িত্ব আমরা কতটুকু বহন করেছি?

জগতে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন তাঁরা সকলেই প্রেম মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করে গেছেন, সেই বাণী মানব সমাজ অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নি সেই কারণেই তৈমুর, এটিলা, চেঙ্গিস খান থেকে আরম্ভ করে হিটলার মুসোলিনি ইয়াহিয়া খান প্রভৃতি সমাজ বিরোধী যুদ্ধবাজদের উদ্ভব হয়েছে, এরা সকলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে যার ফলে পৃথিবীর মানুষের অশেষ দুর্গতি হয়েছে। মানুষের জীবনকে সার্থক করে তুলতে সত্য ও সৌন্দর্যের মত ভালবাসা বা প্রেমের একটি বিশেষ

স্থান আছে। মৈত্রী করুণা বা প্রেম মানব সমাজকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এই প্রেমের মন্ত্রে ভগবান বুদ্ধ অর্ধজগৎকে তাঁর চরণছায়ায় টেনে এনেছিলেন। এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের যুদ্ধে ক্লান্ত সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বৎসরকাল বিনা রক্তপাতে সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন এই সময়ে ভারত সংলগ্ন দেশগুলিতেও পরিপূর্ণ শান্তি বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আরও তিরিশ চল্লিশ বৎসর ধরে এক বিশাল ভূখণ্ডে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘাত বিপ্লবের লেশমাত্র ছিল না—জগতের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। আমাদের তপঃশীর্ণ গান্ধীর হাতেও একটি মাত্র অস্ত্র ছিল সেটি প্রেম। সেই অস্ত্র বলেই ভারতের কোটি কোটি মানুষকে একত্র করে তিনি তাঁদের বিনা রক্তপাতে পরশাসন মুক্ত করে দিয়ে গেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে—সমাজের মধ্যে যে স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতা ও অবিচার বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয় সেইগুলি দূর করা। এ সত্ত্বেও কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে—এটা একপ্রকার মানসিক অবস্থা। চিকিৎসকের সহানুভূতি দিয়ে এদের এই মানসিক অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারা যাবে। এদের কাছে টেনে নিয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার তথা ভালবাসা দিয়ে এদের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনলে এরা আর বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইবে না। সমাজের বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে এরা একদিন সানন্দে যোগদান করতে চাইবে।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো গ্রোটিয়াস

আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে আজ শনৈ শনৈ বিস্তৃতি লাভ করছে। দেশে দেশে কালে কালে প্রাজ্ঞজনের সুচিন্তার মহান ঔদার্য, হিরণ্ময় ফসল জাতি সমূহের পারস্পরিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রটিকে পরিপাটি করে গঠন করে চলেছে অনবরত—অনবরত অসংখ্য সভাসমিতি, সম্মেলন ও সমাবেশের মাধ্যমে। সন্ধি ও চুক্তিপত্রের নির্মিতিতে। এইসব প্রাজ্ঞজন জ্ঞানী তাপসেরা—স্পেনের ভিটোরিয়া (১৪৮০—১৫৪৬)। বালথাজার অ্যায়েলা (১৫৪৮—১৫৮৫)। ইটালীর অ্যালবেরিকাস হেটিলিস (১৫৫২—১৬০৮), স্পেনের অ্যানসিসকো সুয়ারেজ (১৫৪৮—১৬১৭) আমাদের প্রণম্য হয়ে আছেন নিশ্চয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের এই জ্ঞানোন্নতিকে যিনি সর্বপ্রথম একটি পরিণত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, রচনা করেছিলেন অন্ধকারের সনদে এক জ্যোতিমুক্তির স্বর্ণস্বাক্ষর তিনি হলেন আইন পাঠকের এবং/অথবা ব্যবহারজীবী মাত্রেরই চির শ্রদ্ধেয়, চির নমস্য মণীষী হুগো গ্রোটিয়াস। বস্তুতঃ তিনিই আন্তর্জাতিক আইনের জনক।

হুইট ভন গ্রুট, হুগো গ্রোটিয়াস নামেই যিনি বহুল পরিচিত, ১০ই এপ্রিল ১৫৮৩ সালে হলাণ্ডের

ডেলফট নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, আইনবিদ ও দার্শনিক। যদিও প্রথম জীবনে তিনি ব্যবহারজীবীর জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন তথাপি নীরস, মক্কেল ঠকানো কপট জীবিকা দীর্ঘকাল তাঁকে টেনে রাখতে পারে নি। এজলাসের বিতর্কের মুহূর্তের উত্তেজনা, বিপুল আর্থিক উৎসাদনের স্বস্তি তাঁর হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারে নি। পারেনি উদ্ভাসিত করতে। তাই অচিরেই তিনি সেই স্বস্তিমসৃণ উদ্যান থেকে বেগে বেরিয়ে পড়েছেন দারুণ সুন্দর অরণ্যে। নিরাপত্তার বেষ্টন ছেড়ে এবং বিপুল উৎসর্গ বাসনার আমন্ত্রণে বিশ্বমুক্তির মাঙ্গলিক কর্মে। এই এই কারণেই তিনি আদালত ছেড়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রটিকে খুঁজে নিয়েছেন রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে। কিন্তু কেবলমাত্র লঘু, চটুল রাজনীতির হালকা আনন্দ তাঁকে এই ক্ষেত্রে টেনে রাখে নি। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন একে একে নানান জটিল পৌর ও দেওয়ানী কলহে, সংঘর্ষে। কারাবরণ করেছেন সীমাহীন কষ্টে সুদীর্ঘদিন ধরে। ১৬২১ সালে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সহায়তাতে একটি বাক্সবন্দী হয়ে তাঁর কারামুক্তির ঘটনা ভারত ইতিহাসের শিবাজীর কারামুক্তির সঙ্গে তুলনীয় প্রায়। এভাবে একের পর এক তিমির অভিযান শেষ করে হুগো গ্রোটিয়াস অবশেষে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তামাম আইন পাঠক এবং/অথবা ব্যবহারজীবীর হাতে তাঁর পবিত্র আন্তর্জাতিক সংহিতা। ডি জুরে বেল্লি এ্যাক পেসিস। বস্তুতঃ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি—যুদ্ধ ও শান্তির আইন প্রকাশিত হবার পরেই কার্যতঃ আন্তর্জাতিক আইন একটি পরিণত অবয়ব লাভ করলো। ইতিপূর্বে এমন করে আর কেউ আন্তর্জাতিক আইনকে গ্রন্থণার কথা চিন্তা করেন নি। তাঁদের কার্যক্রমে বিক্ষিপ্তভাব ছিল। অসংলগ্নতা ছিল। কিন্তু হুগো গ্রোটিয়াসই সর্বপ্রথম একটি সম্পূর্ণাংগ আন্তর্জাতিক আইনের গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। বিশিষ্ট আইনবিদ ও চিন্তানায়ক ষ্টার্কের মতে, 'তাঁর (জেণ্টোলিস) পরে যিনি এলেন অর্থাৎ হুগো গ্রোটিয়াস, প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিশারী তিনিই আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে তাঁর চিরস্থায়ী প্রভাব অত্যন্ত চিন্তার সঙ্গেই স্মরণীয়।'

গ্রটিয়াসের গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হলো এই যে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের সম্পূর্ণতা একান্তভাবে বিধিবদ্ধ আইনের উপরেই নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন ও আইনহীনতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে দূর করেছেন তিনি। দূর করেছেন ন্যায়যুদ্ধ ও অন্যায়যুদ্ধের মধ্যবর্তী কুয়াশাকে তারপর বহন করে এনেছেন পূর্বাকালে রক্তিম ইংগিত। রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ করবার নিরংকুশ অধিকারকে প্রবল প্রত্যয়ে ধিক্কার হেনেছেন তিনি। বলেছেন, কেবলমাত্র ন্যায়যুদ্ধ—অর্থাৎ যে যুদ্ধের বৈধতা আছে কেবলমাত্র সে যুদ্ধকেই প্রয়োজনীয় বলে মানতে হবে। প্রাকৃতিক আইনকেই আন্তর্জাতিক আইনের স্বাধীন উৎস বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা কিংবা তাদের অভিমতকেই একমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের উৎস বলে মানতে পারেন নি। বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক, তার মধ্যে সৎপ্রবৃত্তি আছে, পরার্থবাদ আছে। আর আছে সুনীতিরও প্রেরণা। মানুষের এই মহান প্রকৃতিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস। রাষ্ট্রগঠনের মূলে আছে ব্যক্তিমানুষ। তাই রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের মূলতঃ কোনই মতদ্বৈত নেই। রাষ্ট্রসমূহ, জাতিগুলি

অন্যান্য সংস্থার মতনই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ধারিত করবার জন্যই আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে।

গ্রোটিয়াস সুযোগ্য নিরপেক্ষতার নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার মানে কোনোদিন ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসা উচিত অন্যান্য দেশগুলির। এই নীতি-নির্দেশকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের কার্যক্রমে গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভিয়েতনামের যুদ্ধ প্রসংগে ও ইজরাইল এবং আরবরাষ্ট্র সমূহের যুদ্ধ প্রসংগে সমগ্র বিশ্বের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবতো বলতে গেলে, সেই অতীতের গ্রোটিয়াস নির্দেশিত ন্যায়যুদ্ধের নীতিকেই অঙ্গুলীনির্দেশ করেছে।

এই মণীষী বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং/অথবা গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেইসব প্রতিজ্ঞা এবং কর্তব্যসমূহের উপরে যা জাতিসমূহ পারস্পরিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মেনেছে—মেনেছে সৎ বিশ্বাসে সুচিন্তার আশ্রয়ে। মানবিক হস্তক্ষেপের প্রসংগে সতত সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন এই মণীষী। কেননা তাঁর মতে এহেন হস্তক্ষেপই ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে—পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সালিশীর মাধ্যমে কলহের মীমাংসাকেই পছন্দ করতেন তিনি। উপরন্তু অন্যরাজ্যে পলাতক অপরাধীকে সেই রাজ্য কর্তৃক প্রত্যার্পণ, রাজদূতদের স্বাধীনতা, অবধি নৌ-পরিচালনা, মুক্ত বাণিজ্য এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন (যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বাস্তু হারিয়েছে) ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গভীরভাবে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সহবাসকে এক সুদূর সংজ্ঞা দান করেছেন এই মহান আইনজ্ঞ।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ টেম্পারামেণ্টাবেল্লিও আন্তর্জাতিক আইনের গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

'সমুদ্রের স্বাধীনতা'-র বিষয়টিকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু উপসাগর ও প্রান্তিক জল বিভাজিকার উপর তিনি রাষ্ট্র বিশেষের মালিকানাকে স্বীকার করেছেন। প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈধ অধিকার সমান একথাও তিনি দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধের আইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে যদি শত্রুপক্ষীয় কোন সৈন্য যুদ্ধকালীন কোন যুযুধ্যান দেশের ভূখণ্ডে ধরা পড়ে তবে তাকে বন্দী করে রাখা চলবে তবে শত্রুতার অবসান হলেই তাকে মুক্তি দিতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে যুদ্ধের সময় ধৃত শত্রুপক্ষের লোককে হত্যা করা চলবে। যদিও প্রথমে তিনি এমন কথা বলেছিলেন যে কেবল শত্রুপক্ষের লোক ধরা পরলে তার সম্পত্তি উৎখাতই যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাদের বন্দী করে রাখার ব্যাপারটিকেও সমর্থন জানান।

যুযুধ্যান রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবিধায়ক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতি ব্যবহারে মুক্তমানসিকতার তিনি একজন উজ্জ্বল সার্থক। কিন্তু পরবর্তীকালেই তিনি এমন লক্ষ্য করেছেন যে ঐ ঐক্যবিধায়ক নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অচিরেই তাঁর স্বার্থের অনুকূলে যুযুধ্যান রাষ্ট্রের একটিকে সমর্থন জানিয়ে থাকে। তারপর অবরোধ সম্পর্কেও তিনি কঠোর মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন যারা অবরুদ্ধ বন্দরের খবরাখবর জুগিয়ে যাবে তাদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

যুদ্ধপণ্য সম্পর্কে পণ্যসমূহকে তিনি তিনটিভাবে বিভক্ত করেছেন। যথা—[১] যুদ্ধের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য—গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ; [২] যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় পণ্য। প্রথম পণ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এই পণ্যকে শত্রুশিবিরে পৌছানোর পথেই অধিকার করতে হবে। দ্বিতীয় পণ্যকে অবরোধ করার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় পণ্যর অবরোধ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবেচনায় আনতে হবে।

গভীর মনোবলের সংগে মানুষের দরবারে উপস্থিত করেছেন হুগো গ্রোটিয়াস তাঁর মতবাদকে। এই সত্যসন্ধী এবং ন্যায় ভিক্ষুক মানবিকতা এবং শান্তির প্রতিপালক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত এবং আর্থিক গুণাবলী তাঁর মতবাদকে সাফল্যের সূর্য্যতোরণে প্রতিষ্ঠিত করছে। আধুনিককালের আন্তর্জাতিক আইনের মতবাদকে চৌরাস্তার মোড়ে এনে পৌছে দিয়েছেন তিনি। এই আইন প্রার্থিব এবং অবিভাজ্য। দার্শনিকরা, প্রাজ্ঞজন এবং বিচারকবৃন্দ প্রাকৃতিক আইনের জন্য আবেদন করেছেন। গ্রোটিয়াস গুরুত্ব দিয়েছেন তাকেই। বলেছেন তাঁর অখণ্ড প্রত্যয়ে যে রাষ্ট্রসমূহের সকল সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করেছে, নির্ধারিত করেছে এই প্রাকৃতিক আইনই। মানুষের মননশীলতা যার প্রত্যাশয় উন্মুখ ছিল হুগো গ্রোটিয়াস তাই-ই বহন করে এনেছেন। তাঁর সাফল্যের সত্যটি হল এই যে মানুষের ব্যাকুলতাকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর নিবিড়, অন্তর্গত উপলব্ধি "সংগ্রাম ও শান্তির" আইন রচনার মধ্য দিয়ে ব্যাকুল বিশ্বমানবতাকে একটি দুর্লভ কুঞ্চিকা হাতে এনে দিয়েছে। তাঁর এই মতবাদই ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত তিনবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের অবসানে ওয়েস্টফ্যালিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পাদনে নিশানা-নির্দেশ দিয়েছিল।

তবু তথাপি সমালোচনা মুক্ত হতে পেরেছেন তিনি ?

সংগ্রাম ও শান্তির আইন বহুলাংশেই দ্রুতগ, অসংগত এবং গভীর সঞ্চায়ী নয়। জাতি সমূহের আইনকে প্রমাণ করতে চেয়ে বারবারই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রাকৃতিক আইনকে। তাঁর পদ্ধতিটিও তাছাড়া ত্রুটিযুক্ত। তিনি না ছিলেন প্রত্যয়বাদী না প্রকৃতিবাদী ; না করেছেন তিনি প্রাকৃতিক আইনের সংগে রাষ্ট্রিয় আচার বিধিসমূহের যোগসাধন। প্রাকৃতিক আইনের উপর অসম্ভব আস্থাবশত দাসত্বকে ন্যায়সংগত বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। নানারকম ন্যায়নীতির মধ্যে তিনি পার্থক্যের রেখা অংকন করেছেন কিন্তু তার নেপথ্যবর্তী উদ্দেশ্যকে দেখান নি। যুদ্ধকে মানবায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধের বৈধতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বীকার করে সন্ধির উদ্দেশ্যকে অসার প্রমাণিত করেছেন অবলীলায়। কোন পরিচালককেই প্রতিরোধ করার অধিকারকে স্বীকার করেন নি তিনি—এমন কি একজন প্রতিক্রিয়াশীল শাসককেও এবং একজন স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও তিনি অন্যায়বলে ঘোষণা করেছেন। গ্রটিয়াসের এই চিন্তাকে যদি স্বাভাবিকভাবে এবং পরিছন্নরূপে মেনে নেওয়া যায় তাহলে কাইজার হিটলার মুসোলিনীর মতন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে, ফ্রাঙ্কোর মতন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এবং একালের ইয়াহিয়া খাঁ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মনোভাব ব্যক্ত হবে কিভাবে, তা' রীতিমত ভাববার বিষয়। গোল্ডামেয়ারের দাপট চলবে। দাপট চলবে ওয়াশিংটন, পিকিং, মস্কোর। গ্রোটিয়াসের এই মতবাদকে মেনে নিলে কোনদিনই আর বিশ্বব্যাপী দুর্বল রাষ্ট্রগুলি প্রবল রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে সামিল হতে পারবে না।

তা স্বত্বেও আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে হুগো গ্রাটিয়াস একটি নামময় ঐতিহ্য বলে মানতে হবে। অবশ্য বাদ দিতে হবে তাঁর চিন্তার অপরিচ্ছন্ন দিকটিকে। যা সে যুগে সত্য হলেও বর্তমান ও আগামীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে গ্রহণ অথবা বর্জন করবে।

সে যাই হোক, আমরা সমস্বরেই বলবো, "আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়ে একদিকে গ্রোটিয়াসকে পাওয়া তবুও একটি পরম লাভ। তাঁর রচনা একটি সঞ্জীবনী শক্তি। বিগত শতাব্দীর মতন বর্তমানে আর তাঁকে তেমনভাবে পড়া হয় না, কিন্তু তাঁর চিন্তার নির্যাস সভ্যজগতের বিবেকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত।"

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সমালোচনা

লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ॥ ভূদেব চৌধুরী। 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত। মূল্য: ৮ টাকা

অবনীন্দ্রনাথ মূলত চিত্রশিল্পী, দেশে-বিদেশে এই তাঁর গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়। অথচ আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ পদের জন্য আবেদন করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আবেদন পত্রে লিখেছিলেন যে তিনি বাংলা সাহিত্যেও 'কিঞ্চিৎ খ্যাতি' লাভ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক খ্যাতির মূলে তাঁর 'রবি-কা'। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ—রবীন্দ্রনাথ 'বাল্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশের আয়োজন করেছেন যাতে বাংলা শিশু সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার হয়। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করলেন লিখতে ('তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।'—'তুমি লেখোই-না, ভাষার কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।')। অবনীন্দ্রনাথ 'ছবি লেখা'র ফাঁকে ফাঁকে কথা লিখতে শুরু করলেন, রূপ নিল 'শকুন্তলা'—বাল্যগ্রন্থাবলীর প্রথম বই, শ্রাবণ ১৩০২-এ প্রকাশিত হল। এর পরে ফাল্গুন ১৩০২-এ 'ক্ষীরের পুতুল'-এর আবির্ভাব। ফার্সিছাঁদের বঙ্গাক্ষরে এই রচনাধারা অবনীন্দ্রনাথের শেষ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গল্প, প্রবন্ধ, শিল্প-প্রবন্ধ, নাটক ও পালা নিয়ে তাঁর রচনাসংখ্যা রীতিমত সমৃদ্ধ, যে কোন সাহিত্যিকের কাছে ঈর্ষার ব্যাপার। আবার, শুধু গদ্যের জগতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি অবনীন্দ্রনাথ—পদ্য এবং গদ্য ছন্দের জগতেও বিচরণ করেছেন। অথচ তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণপুরুষ—ছবিই তাঁর নিজের জগৎ।

অবনীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। সিগনেট প্রকাশিত 'ক্ষীরের পুতুল'-এর পরিচয়িকা হিসেবে মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় কিছু লেখা আছে, তার একটি অংশ—'এই গল্প সকল যুগের সকল বয়েসের চিত্ত জয় করার মতো করে যিনি লিখতে পারেন তাঁকে নিয়ে সাহিত্য ধন্য হয়।' অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়মূলক গ্রন্থ নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে শ্রীভূদেব চৌধুরী 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ঋষি ঋণ পরিশোধ করে বাঙালি সুধীসমাজের মান বাঁচিয়েছেন, এ কথা কোনক্রমেই অত্যুক্তি নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিধি লেখক নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন—" 'লিপির শিল্পী' অবনীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা প্রচলিত আক্ষরিক অর্থেও ছিলেন তাই;—ফারসি হরফের ধাঁচে তাঁর বঙ্গাক্ষর লিখনের অভিনব কলাকুশলতা সুবিদিত। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে 'লিপি' অর্থে 'অক্ষর বিন্যাস' বুঝি নি, বুঝতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি শিল্পীর 'লিখিত বিষয়'-কে।...অবনীন্দ্রনাথের 'লিখিত বিষয়' বলতে তাঁর বক্তব্যের চেয়েও বাড়া যা,—তাঁর বাণীর প্রেরণা—তাকেই উপলব্ধি এবং আস্বাদন করাই ছিল মৌল আকাঙ্ক্ষা।" বলাবাহুল্য লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা পূর্ণ মাত্রায় সজাগ রেখে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এগার পৃষ্ঠার অবতরণিকাসহ এই গ্রন্থে চারটি অধ্যায় আছে—১. শিল্পী : ব্যক্তি : ব্যক্তিত্ব

২. গদ্যের শিল্পী ৩. রূপবাণীর শিল্পী ৪. শিল্পের সন্ধানী। অবতরণিকাসহ প্রত্যেকটি অধ্যায়ই প্রাসঙ্গিক নির্দেশ-পঞ্জী-যুক্ত। ঋণ ও ভ্রমস্বীকার এবং শুদ্ধিপত্রসহ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪+১৯৫। সুমুদ্রিত ও সুপরিবেষিত এই গ্রন্থখানি হাতে নিলেই পাঠক প্রথমাবধি একটি পরিশীলিত রুচির পরিচয় পাবেন।

আলোচ্য গ্রন্থ পাঠকালে পাঠক নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করবেন কেমন একান্তভাবে লেখক বিষয়-তন্ময়তায় মগ্ন হয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ে লেখক অবনীন্দ্রনাথের মানস গঠনের রূপটি উদ্ঘাটিত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের মানসলোক গঠনের উপাদান ও ধর্ম আলোচিত হয়েছে। পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পরিবারদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে লেখক দুই পরিবারের দুই বিশ্বগ্রাসী প্রতিভার স্ফুরণের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। এতে পাঠক স্বচ্ছন্দে অবনীন্দ্র-মানসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারবেন। ছোট ছোট ঘটনার নক্সা এঁকে লেখক অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিরূপটিকে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলেছেন এই অধ্যায়ে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক অনায়াস-লব্ধ দক্ষতায় বাংলা গদ্যসাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এজন্য আয়োজনের আড়ম্বর নেই, কিন্তু ঐশ্বর্যের দীপ্তি আছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য যে ঘরোয়ারূপ বিশেষত মেয়েলি ঢং-সমৃদ্ধ, অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে লেখক তা দেখিয়েছেন। এই অধ্যায়েই লেখক গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শব্দসচেতনা-সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। এই সূত্রে লেখক যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন, 'আসলে অবনীন্দ্র-ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল এই,—বাগর্থ নিয়ে এক চারুক্রীড়া,—যার অন্তরঙ্গে ছবি আর গান, বহিরঙ্গে অশিক্ষিত পটু অপরিমার্জনার ছদ্মবেশে অনুশীলনতীক্ষ্ম ভাষাবিদ্ মনের কৌতুক হাসির ঝলক—যুগপৎ মন আর মননের 'দুষ্টু বুদ্ধি'-ভরা মিশোলে গড়া।'

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে রূপবাণীর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত জটিল। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যে স্বরূপত 'চিত্রকর'—এই সিদ্ধান্তটি ব্যক্ত করার জন্য লেখক এমনভাবে আলোচনা করেছেন যাতে পাঠক এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকের সন্ধান পায়। এজন্য তিনি উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়েছেন, তত্ত্বের পর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, বাণীর জগৎ এবং ছবির জগৎ থেকে বিষয় নির্বাচন করে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের হাতের গুণে আমাদের চেনা জানা উপকরণ কিভাবে নতুন সুষমায় মণ্ডিত হয়ে আমাদের নয়ন মন মুগ্ধ করেছে তার সার্থক পরিচয় এই অধ্যায়ে বিধৃত। লেখকের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞান সদাসতর্ক থেকে সুসংহতভাবে আপন বিষয়কে সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এ এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

'শিল্পের সন্ধানী' এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে সৌন্দর্যরসের অনুসন্ধানী রসিক অবনীন্দ্রনাথের মর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'বাংলার ব্রতকথা'-তে যে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, এই সংবাদটি পরিবেষণ করে লেখক অবনীন্দ্রনাথের মনোজগতের রূপটি বিশ্লেষণ করেছেন। শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা অবনীন্দ্রনাথ কোন্ দৃষ্টির আলোকে, রসবোধের কোন্ স্তরে উন্নীত হয়ে শিল্পকে দেখেছেন তার পরিচয় এই অধ্যায়ে লভ্য।

এ গ্রন্থের জন্য লেখকের প্রতিষ্ঠা বাঙালি পাঠক সমাজে দৃঢ়তর হবে। পক্ষান্তরে বাংলা

সমালোচনা সাহিত্যও এই গ্রন্থের দ্বারা সমৃদ্ধতর হল, একথা নিতান্তই সঙ্গত।

প্রসঙ্গত কয়েকটি ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করছি। 'শিল্পী : ব্যক্তি : ব্যক্তিত্ব' এবং 'গদ্যের শিল্পী' অধ্যায় পরিচয়হীন, কিন্তু 'রূপবাণীর শিল্পী' এবং 'শিল্পের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় নামে অভিহিত। এ অসঙ্গতি না থাকলেই ভাল হত। লেখকের ভাষা এবং শব্দ নির্বাচন সতর্ক, পরিশীলিত তবু 'তুলিকাঙ্কন', 'জিজ্ঞাসুতা', 'বক্তৃতীর্ণ' ধরণের শব্দগুলি পাঠস্বাচ্ছন্দ্যে বাধা সৃষ্টি করে।

পরিশেষে একটি বাসনা ব্যক্ত করতে চাই—এ গ্রন্থে যদি পরিশিষ্ট হিসেবে অবনীন্দ্র-জীবন-পঞ্জি এবং রচনা-পঞ্জি থাকত তবে গ্রন্থখানি পড়ার সময় উদ্ভূত নানা কৌতূহল সহজে নিবৃত্ত হত।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পরিবার

সাজানো বাগান ! হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার সুন্দর ছিমছাম সংসারটি যেন সাজানো বাগান !

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে, স্ত্রীর ভরণপোষণ—এই নিয়ে আপনার কত রঙীন স্বপ্ন, কত আশা, কত কল্পনা ! ওদের কোনো অভাবই তো আপনি রাখেন নি ! কিন্তু···কে বলতে পারে ? দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ যদি আপনার কিছু একটা হয়ে যায়—তাহলে ? আপনার সাজানো বাগান কি শুকিয়ে যাবে ? ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে, কিছুই কি হবে না ? স্ত্রীর ভরণপোষণের কি হবে ?

এ নিয়ে ভাবনার কারণ নেই। লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের বিবিধার্থসাধক বীমার মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। আজই নিকটস্থ এল. আই. সি -র অফিসে এসে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জেনে নিন।

জীবন বীমার বিকল্প নেই

mem/lic/9 ben